উমরাহ্ ও হজ্জের বিধিবিধান

আব্দুল হামীদ ফাইযী

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

আম্মা বা'দ, বাংলা ভাষায় হজ্জ ও উমরার বই-এর অভাব নেই। তবে তার কোনটি একেবারে সংক্ষিপ্ত। কোনটি বা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা থাকার ফলে আকারে দীর্ঘ। একাধিক বার হজ্জ-উমরাহ করার পর অধমের যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে এবং নানা দেশ ও মযহাবের হাজীদেরকে হজ্জ-উমরাহ করতে যে সব ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাই সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরার জন্য এই পুস্তিকার অবতারণা। ভ্রমণ-কাহিনী ও হারাম শরীফ তথা সঊদী আরবের সৌন্দর্যের কথা অনেকের জানা। যা জানা নয় তা হল, এত বড় ব্যয়বহুল ইবাদতের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি। অতএব সঠিক নিয়ম-পদ্ধতির দিকটাই খেয়াল করে কেবল সেই দিকটাই প্রাধান্য দেওয়া হল এই পুস্তিকায়।

বহু ভুল-ভ্রান্তি ও সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিশিষ্টে কিছু ফতোয়া সংকলিত হয়েছে। দাওয়াতী ভাই জনাব সালাহুদ্দীন সাহেবের পরামর্শে 'যুলহজ্জের তেরো দিন' থেকে কেবল হজ্জ সম্পর্কিত মাসায়েলকে পৃথক করে ছোট সাইজে প্রকাশ করা হল।

আশা করি হজ্জ করতে ইচ্ছুক মুসলিমের জন্য অত্র পুস্তিকা একটি পাথেয় এবং সুন্দর উপহার হবে। মহান আল্লাহর কাছে আমার আকুল আবেদন যে, তিনি যেন আমার ও প্রকাশকের এই নগণ্য খিদমতকে কবুল করে নেন এবং কাল কিয়ামতে এর অসীলায় আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা ও ওস্তাযগণের মুখ উজ্জ্বল করেন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
ডিসেম্বর, সন ২০০৬ইং

হজ্জ

যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের মধ্যে হজ্জ আদায় করা সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্যতম। অতএব যাকে আল্লাহপাক তাঁর গৃহের হজ্জ করার তওফীক দান করেছেন এবং যে যথার্থরূপে হজ্জ পালন করতে প্রয়াসী হয়, সে ইনশাআল্লাহ রসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বাণীতে তার মহাভাগ থাকবে, "মঞ্জুরকৃত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়।" যার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হজ্জ সামর্থ্যবান মুসলিম (পুরুষ বা নারী) এর উপর আল্লাহর তরফ হতে এক ফরযকৃত আমল। তিনি বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে যার (মক্কায় যাবার) সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ (কা'বা) গৃহের হজ্জ করা তার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য (ফরয)। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে,) নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী।" (তিনি জগতের উপর নির্ভরশীল নন।) *(কুঃ ৩/৯৭)*

কুরআনের এই আয়াতের বাচনভঙ্গি আরবী ভাষায় অত্যাবশ্যকতার (ফরয বা ওয়াজেব হওয়ার) উপর বড় তাকীদ বহন করে; যে গুরুত্বপূর্ণ তাকীদ দ্বারা হজ্জকে ফরয করা হয়েছে

এবং তার মর্যাদাকে সুউন্নত করা হয়েছে। অতঃপর তার সাথে 'কুফ্র' শব্দ যুক্ত হয়ে ফরযকে অধিক শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ করেছে। আর এই ফরযকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারকারীর প্রতি তিরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। *(ফতহুল কাদীর ১/৩৬৩)*

আল্লাহর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "ইসলাম পাঁচটি (স্তম্ভের) উপর প্রতিষ্ঠিত; আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর দূত (রসূল) এই সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর (মক্কা মুকার্রামায় অবস্থিত কা'বা শরীফের) হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা পালন করা।" *(বুখারী ৮নং, মুসলিম)*

হজ্জ জীবনে একবার ফরয। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "হজ্জ একবার, যে ব্যক্তি অধিকবার করবে তা (তার জন্য) নফল হবে।" *(আবূদাঊদ ১৭২১নং)*

অবশ্য উমরাহ ফরয কিনা তা নিয়ে উলামাদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। তবে তা ত্যাগ করা উচিত নয়। জীবনে অন্ততঃ একবার তা পালন করা কর্তব্য।

হজ্জ করার পূর্বেও উমরাহ করা যায়। ইবনে উমার ؓ বলেন, "এতে কোন ক্ষতি নেই। নবী ﷺ হজ্জের পূর্বে উমরাহ করেছেন। *(বুখারী ৩/৫৯৮)*

রসূল ﷺ এই দুই ইবাদত করার উপর উম্মতকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। যেহেতু এই ইবাদতের মাঝে রয়েছে চিত্তশুদ্ধি,

গোনাহর ময়লা ও দাগ হতে আত্মা-প্রক্ষালন। যাতে মুসলিম পরকালে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সমাদর পাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করে এবং (সেই হজ্জে) যৌনাচার ও কোন পাপ (বা অন্যায় কাজ) না করে, তবে সে সেই দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে, যেদিন তার জননী তাকে প্রসব করেছিল।" *(বুখারী ১৪৪৯, মুসলিম ১৩৫০নং)*

তিনি আরো বলেন, "এক উমরাহ হতে অপর এক উমরাহ, উভয়ের অন্তর্বর্তী কালীন পাপসমূহের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। আর (আল্লাহর নিকট) গৃহীত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছু নয়।" *(বুখারী ১৬৮৩, মুসলিম ১৩৪৯নং)*

গৃহীত হজ্জ সেই হজ্জকে বলা যেতে পারে, যে হজ্জ বিশুদ্ধচিত্তে করা হয়, যার সমুদয় রীতি-নিয়ম যথার্থরূপে পালন করা হয়, যা সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয়, মঙ্গল ও সদাচার দ্বারা পূর্ণ হয় এবং যৌনাচার কলুষ ও তর্ক-বিবাদ হতে বিশুদ্ধ হয়।

অবশ্য প্রয়োজনে সদ্ভাব ও সৌজন্যের সাথে তর্ক করা অবৈধ নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে কোন শরয়ী সমস্যা নিয়ে সদ্ভাবে বিতর্ক করাও নিরর্থক, যেমন অন্ধানুকরণ, অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি বিতর্ক ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ৮পৃঃ)*

হজ্জের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক। আল্লাহর পথে জিহাদের পর মর্যাদায় এই হজ্জেরই স্থান রয়েছে। যেমন পূর্বে এক হাদীসে

উল্লেখিত হয়েছে।

ঐ হজ্জের একটি প্রধান অঙ্গ আরাফাত ময়দানে অবস্থান। সকল হাজীকে নবম যুলহজ্জে ঐ ময়দানে কিছুকালও অবস্থান করতেই হয়। যেদিনের মর্যাদা প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, "আরাফাতের দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই, যাতে আল্লাহ পাক বান্দাকে অধিক অধিক অগ্নিকুন্ড থেকে মুক্ত করে থাকেন। তিনি (ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'কি চায় ওরা?" *(মুসলিম ১৩৪৮নং)*

হজ্জের অধিকাংশ কার্যাবলীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে মহানবী ﷺ বলেন, "পবিত্র কা'বার দিকে স্বগৃহ থেকে তোমার বের হওয়াতে, তোমার সওয়ারীর প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ একটি করে সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং একটি করে পাপ মোচন করবেন।

আরাফায় অবস্থান কালে আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'আমার ঐ বান্দাগণ আলুথালু কেশে ধূলামলিন বেশে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে আমার কাছে এসে আমার রহমতের আশা করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে, অথচ তারা আমাকে দেখেনি। তাহলে তারা আমাকে দেখলে কি করত? সুতরাং তোমার যদি বালির পাহাড় অথবা পৃথিবীর বয়স অথবা আকাশের বৃষ্টি পরিমাণ গোনাহ থাকে, আল্লাহ তা ধৌত করে দিবেন।

পাথর মারার সওয়াব তোমার জন্য জমা থাকবে।

মাথা নেড়ার করলে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লিখা হবে।

অতঃপর কা'বাগৃহের তওয়াফ করলে তুমি তোমার পাপরাশি থেকে সেই দিনের মত বের হবে, যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩৬০নং)*

প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি ক'রে পাপমোচন হবে, একটি ক'রে সওয়াব লেখা হবে এবং একটি ক'রে মর্যাদা বর্ধন হবে। *(হাকেম, ইবনে হিব্বান, সঃ তারগীব)*

হজ্জের সমস্ত শর্তাবলী পূর্ণ হলে (ভারপ্রাপ্ত) মুসলিমের উপর ওয়াজেব, সে যেন বিলম্ব না করে সত্বর হজ্জের ফরয আদায় করে। যেহেতু বিনা ওযরে হজ্জ পালনে বিলম্ব বা গয়ংগচ্ছ করলে সে গোনাহগার হবে। *(আল ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ ১১৫ পৃঃ)*

অনেক যুবক হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও ভাবে, এখন হজ্জ করলে ফিরার পর মরণ পর্যন্ত বহু সময় বাকী থাকবে, তাতে পাপও হবে বেশী। তাই মরণের পূর্বকাল বার্ধক্যের অপেক্ষা করে। অথচ মিসকীন জানে না যে, তার মৃত্যু কখন আসবে। ফলে এইভাবে ফরয আদায়ে অবহেলা করে। অনেকে পিতা-মাতার বর্তমানে হজ্জ হয় না মনে করে। ফলে এই সব খোঁড়া ওজুহাত ও ছল-বাহানা করে যখন মরে, তখন মহাপাপী হয়ে মরে।

সামর্থ্যবান পিতা অথবা অভিভাবকের কর্তব্য তার অধীনে সকল পরিজনের জন্য হজ্জের সুবন্দবস্ত করে দেওয়া, যাতে তারাও

নিজের ফরয আদায় করতে সক্ষম হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে।" *(বুখারী ৮৫৩, মুসলিম ১৮২৯, তফসীর আযওয়াউল বায়ান ৫/১০৮)*

হজ্জ করার সামর্থ্য ও সুযোগ হওয়ার পর তা অবিলম্বে পালন করার ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটাই সমালোচনা থেকে খালি নয়। তবে এ বিষয়টি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহর আদেশ পালনে বা কোন সৎকাজে শীঘ্রতা করা ও ফরয আদায়ে প্রতিযোগিতা ও তড়িঘড়ি করা ওয়াজেব। ঐ সমস্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিনা ওজরে ও বাধায় ফরয আদায়ে বিলম্ব করলে গোনাহগার হবে। যেমন, "(ফরয) হজ্জ পালনের জন্য শীঘ্রতা কর। কারণ, তোমাদের কেউ জানে না যে, তার কি অসুবিধা উপস্থিত হতে পারে।" *(মুসনাদে আহমাদ ১/৩১৪, ইরওয়াউল গালীল ৪/১৬৮)*

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ)

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য; যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান; যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(কুঃ ৩/১৩৩)*

অন্যত্র তিনি বলেন, **(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)**

অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। *(কুঃ ২/১৪৮)*

হজ্জের শর্তাবলীর মধ্যে সাবালকত্ব ও সামর্থ্য অন্যতম। তবে ছোট নাবালক-বালিকা যদি পিতা-মাতা বা অপর কারো সাথে হজ্জ করে তাহলে সে হজ্জ শুদ্ধ হবে এবং পিতা-মাতা সওয়াবের অধিকারীও হবে। কিন্তু ঐ হজ্জ করে তাদের ফরয আদায় হবে না। বলা বাহুল্য, সাবালক হওয়ার পর যদি হজ্জের অন্যান্য শর্ত পূরণ হয় তবে তাদের উপর আবার হজ্জ আদায় ফরয হবে।

সামর্থ্য সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন, "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।" *(কুঃ ৩/৯৭)* আর সামর্থ্যবান সেই ব্যক্তি, যে সশরীরে নিজের উত্তম (হালাল) সম্পদ দ্বারা হজ্জ করার ক্ষমতা রাখে। ধনবল না থাকলে ঋণ করে হজ্জ করা জরুরী নয়। যেমন ঋণগ্রস্ত থাকলে হজ্জ ফরয নয়। *(আল মুমতে' ৭/৩০)*

যদি কেউ শারীরিক অক্ষম হয় কিন্তু সম্পদে সক্ষম থাকে, তবে দেখতে হবে যে, তার ঐ দৈহিক অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার আশা আছে কি না? যদি বার্ধক্য অথবা চিররোগের কারণে হজ্জে অসমর্থ হয়, তবে সে তার সম্পদ দিয়ে অপরকে নায়েব করে হজ্জ করাবে। আর যদি ঐ অক্ষমতা দূর হওয়ার আশা থাকে, তবে আরোগ্যলাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিজে হজ্জ আদায় করবে। আবার অপেক্ষাকালে যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে ত্যক্ত সম্পদ হতে তার ছেলেরা বা অন্য কেউ (তার নামে) হজ্জ করবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি অপরের তরফ থেকে নায়েব হয়ে (অপরের নামে) হজ্জ করবে তার জন্য শর্ত হল, সে যেন পূর্বে তার নিজের ফরয হজ্জ আদায় করে থাকে। নিজে হজ্জ না করে থাকলে অপরের নামে হজ্জ হবে না। অনুরূপভাবে উমরাতেও এই সব নীতি মান্য ও পালনীয়। এতে পুরুষের তরফ থেকে নারী অথবা নারীর তরফ থেকে পুরুষ হজ্জ বা উমরাহ করতে পারে।

কারো দ্বারা হজ্জ করালে এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিত, যে হজ্জের সমস্ত কর্তব্য বা আহকাম জানে এবং নেক ও পরহেযগার লোক হয়, যার হজ্জ কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক আশা রাখা যায়। অনুরূপভাবে প্রতিনিধিরও উচিত, এ কাজে আল্লাহর জন্য তার চিত্তকে বিশুদ্ধ করা। এর মাধ্যমে পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে ইবাদতের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা রাখা। মুসলিম ভায়ের এই ইবাদত আদায় করে তাকে উপকৃত করা এবং অবহেলা না করে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত হজ্জের কর্তব্য আপ্রাণ চেষ্টার সাথে সমাধা করা। যেহেতু একজনের তরফ হতে ইবাদতে প্রতিনিধিত্ব নেওয়া এক আমানত। এ আমানতে খেয়ানত করা অবশ্যই তার জন্য বৈধ নয়।

যেমন কোন মুসলিমের জন্য এও হালাল নয় যে, সে হজ্জকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম ও সুযোগরূপে গ্রহণ করে এবং কেবল অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে অপরের নিকট হতে অর্থ নিয়ে তার প্রতিনিধিরূপে হজ্জ করে। উদ্দেশ্য এই হলে অবশ্যই তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ওদেরই জন্য পরলোকে আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে। আর ওরা যা করে থাকে (নিয়তে খারাবির জন্য) তা নিরর্থক হবে। *(কুঃ ১১/১৫-১৬)*

অবশ্য হজ্জ আসল উদ্দেশ্য হলে হজ্জের মৌসমে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রুজী অনুসন্ধান করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা বা প্রয়োজনীয় কোন জিনিসপত্র খরিদ করে দেশে আনা দোষের কথা নয়। যদি তা আসল কর্তব্য থেকে বিরত না রাখে, ব্যবসা হালাল উপায়ে হয় এবং তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান মনে করা যায় তবে। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন, "সুবিদিত মাসে হজ্জ হয়। যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জের ইহরাম বাঁধে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-মিলন (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। আর তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা (হজ্জের জন্য) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তাকওয়া (পরহেযগারী বা আত্মসংযম)ই হল শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর। <u>তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসন্ধানে কোন দোষ নেই।</u> সুতরাং যখন তোমরা আরাফাত হতে (দ্রুত গতিতে) প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামে (মুযদালিফায়) পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ (তাঁর যিকর) করবে। যদিও পূর্বে তোমরা

বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফেরে সেখান থেকেই ফিরে চল। আর আল্লাহর কাছে মার্জনা চাও, বস্তুতঃ আল্লাহ মার্জনাকারী পরম দয়ালু। অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে। এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে (সবকিছু) দাও। বস্তুতঃ তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" *(কুঃ ২/১৯৭-২০২)*

হজ্জে যাওয়ার পূর্বে

মুসলিম হজ্জ করার সংকল্প করলে নিম্নোক্ত কর্মাবলীর অনুসরণ করার চেষ্টা করবে;

১। ইস্তেখারার দুই রাকআত নামায আদায় করে সময়াদি নির্বাচনে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে।

২। বিশুদ্ধ তওবা করে নেবে। কারো কিছু নাহক আত্মসাৎ করে

থাকলে তা প্রত্যার্পণ করবে, কারো প্রতি যুলুম করে থাকলে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে, ঋণ থাকলে পরিশোধ করে দেবে, কারো আমানত থাকলে তা ফেরত দেবে, কাউকে অসিয়ত করার থাকলে লিখে দেবে। কারণ, সে বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা তা জানে না। পরিবার-পরিজনের জন্য পরিমিত খরচ-পাতি দিয়ে যাবে, পিতা-মাতা বা তত্তুল্য কেউ থাকলে তাদের সম্মতি নিয়ে ও তাদেরকে সন্তুষ্ট করে যাবে। চাকুরী থাকলে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছুটি নেবে। *(মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)*

৩। পথের জন্য যথেষ্ট সম্বল সাথে করে নেবে। সম্ভব হলে বেশী বেশী পাথেয় সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনে অপরের সাহায্য করবে। তবে এই পাথেয়র সবটুকুই হালাল মাল থেকে হওয়া একান্ত জরুরী। যেমন সফরের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীরুতা এক মহা সম্বল। যেহেতু তাকওয়াতে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি সঞ্চয় হয়, সঙ্কট-মুহূর্তে সুরাহা সৃষ্টি হয়, সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়, পাপ মোচন হয় এবং মহাপুরস্কার লাভ হয় ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى))

অর্থাৎ, "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। আর তাকওয়াই হল শ্রেষ্ঠ পাথেয়। *(কুঃ ২/১৯৭)* জ্ঞাতব্য যে, এমন সফরে তাওয়াক্কুল এর নাম নিয়ে সম্বল ছাড়াই বের হওয়া প্রকৃত তাওয়াক্কুল নয়, বিদআত। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ৪৮পৃঃ)*

৪। হজ্জের সফরের জন্য সহায়ক, সওয়াব-প্রিয় নেক সঙ্গী নির্বাচন

করবে। একাধিক সাথী হলেই উত্তম। জামাআতে একজন আলেম হলে তো সোনায় সোহাগা। যিনি হজ্জের বিভিন্ন আহকামে সতর্ক করবেন, সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করবেন, সারা সময়টাকে তেলাঅত, যিক্র বা কোন হজ্জ সম্পর্কিত কিতাব পঠনের মাধ্যমে কাটাতে প্রয়াসী হবেন।

৫। নামায কসর ও জমা করা ইত্যাদি সহ সফরের বিভিন্ন কর্তব্য জানবে। হাজী মহিলা হলে তার সাথে স্বামী অথবা কোন মাহরাম (যার সঙ্গে ঐ মহিলার চিরতরে বিবাহ হারাম যেমন, জ্ঞাতিত্বে পিতা, পুত্র, (আপন বা সৎ) ভাই, চাচা। দুগ্ধ সম্পর্কে দুধ পিতা, পুত্র, দুধ ভাই বা চাচা। বৈবাহিক সম্বন্ধে (আপন) জামাই বা শ্বশুর ইত্যাদি থাকা জরুরী। আর এও জরুরী যে, সে মাহরাম যেন সাবালক ও সুস্থ জ্ঞান ও মস্তিষ্কের হয়। কারণ, তাছাড়া একজন মহিলার সুসংরক্ষণ সম্ভব নয়।

মহিলার সাথে মাহরাম শর্ত হওয়ার ব্যাপারে তার যুবতী বা বৃদ্ধা হওয়ায় কোন পার্থক্য নেই। যেমন সফর দীর্ঘ হোক অথবা ছোট, পানি, স্থল বা বিমান পথ হোক, হজ্জের বা অন্য কোন সফর হোক সর্বক্ষেত্রে সকল সফরের জন্য এই শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী। যেহেতু এ বিষয়ে প্রিয় রসূল ﷺ এর সাধারণ উক্তি, "মাহরাম ছাড়া মহিলা যেন সফর না করে।" *(বুখারী ১৭৬৩, মুসলিম ১৩৪১নং)*

প্রকাশ যে, মুখে পাতানো ভাই, পীর (?) ভাই, চাচাতো, ফুফাতো, খালাতো, মামাতো ভাই, দেওর, ভাশুর, পোষ্যপুত্র ইত্যাদি আপন

ভাই বা পুত্র হয় না, তারা মাহারেম নয় এবং তাদের সাথে সফর বৈধ নয়।

জামাআতে কতকগুলি বিশ্বস্ত মহিলা হলেও তারা কোন মহিলার মাহরামের বিকল্প হতে পারে না। যারা এ অভিমতকে সমর্থন করেন তাঁদের ভিত্তি দুর্বল এবং পূর্বোল্লেখিত সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর ও তাঁর রসূল (মহিলার সফরের ব্যাপারে) যে শর্ত আরোপ করেছেন সেই শর্ত আরোপ করাই অধিক উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং তার যুক্তিও স্পষ্ট। যেহেতু নারী দুর্বল। প্রতিরক্ষা ও হেফাযত ছাড়া সহসায় সে বিপদের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে সফরে ওঠা-নামা ইত্যাদির ব্যাপারে নারী সহায়তার মুখাপেক্ষিনী হয়। অতএব এমন সহায়কের দরকার যে তার প্রয়োজন মিটাবে, দেহ স্পর্শ করে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবে। সে এবং তার সঙ্গিনী অন্যান্য নারীদের জন্যও একই সাহায্যের প্রয়োজন। আর মাহরাম ব্যতীত এ কাজে কারো সহযোগিতায় নিরাপত্তা নেই; যদিও (ঐ গায়ের মাহরাম) সর্বশ্রেষ্ঠ মুত্তাকী বা ভাল লোক হয়। যেহেতু হৃদয়-মন শীঘ্র পরিবর্তনশীল এবং শয়তান সুযোগ সন্ধানী। আর চরিত্র বিজ্ঞানী প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন নারীর সাথে কোন (গায়ের মাহরাম) পুরুষ নির্জনতাবলম্বন করলেই শয়তান তাদের তৃতীয় (কোট্না) হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ ১/২৬, তিরমিযী ২১৬৫নং)*

উল্লেখ্য যে, বিধবা ইদ্দতে থাকলে হজ্জের সফরে বের হতে পারে

না। ইদ্দতের সময় পার করে মাহরামের সাথে সফরে বের হবে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতে থাকলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে কোন মাহরামের সাথে হজ্জ করতে পারে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৪)*

৬। জামাআতবদ্ধ হাজীদের উচিত, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, ধৈর্যশীল ও সফর বিষয়ে বহুদর্শী কোন একজনকে আমীর বা নেতা নির্বাচন করা। যিনি সকলের পরামর্শ নিয়ে নেতৃত্ব দেবেন। এক একজনের উপর যথোপযুক্ত কার্যভার অর্পণ করবেন; যাতে যৌথভাবে সকলের পক্ষে সফরের ভার হাল্কা হবে। অবশ্য এই স্বার্থে অন্যান্যদের উচিত, যাতে সকলের লাভ আছে এবং যা শরীয়ত পরিপন্থী নয় তাতে আমীরের আনুগত্য করা। এ বিষয়ে আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “যখন কোন তিনজন সফরে বের হবে তখন তাদের জন্য জরুরী, একজনকে আমীর নির্বাচন করা।” *(আবূ দাঊদ ২৬০৯নং)*

৭। সফরে বিভিন্ন আদব-কায়দার অনুসরণ করবে। যেমন, ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ, গাড়ি চড়ার দুআ, পরিজনকে বিদায়কালীন দুআ পড়া, নেক লোকদের কাছ থেকে অসীয়ত ও নসীহত চাওয়া, কোন স্থানে অবস্থানকালে দুআ পাঠ, উঁচু পথে চড়ার সময় তকবীর পড়া, নীচু পথে নামার সময় তসবীহ পড়া, পথের মধ্যে অবস্থান না করা ইত্যাদি।

৮। সফরের সদাচারে চরিত্রবান হবে। পথ ও হজ্জ আদায়ের কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করবে। অপরের ভুল সহ্য ও ক্ষমা করবে। নম্রতা, সদ্ব্যবহার, স্বার্থত্যাগ, পরহিতৈষণা ব্যবহার করবে। হিংসা, বিতর্ক ও

বিবাদ থেকে দূরে থাকবে। আমীরের আনুগত্য করবে। সঙ্গীদের অভিমতের বিপরীত একাকী কোন ভিন্ন মত নিয়ে তাদের বিরোধিতা করবে না। আপোসে পরস্পরের খিদমত করতে প্রয়াসী হবে। যথাসম্ভব নিজের খিদমত নিজে করবে এবং অপরের খিদমত করতে ও যথাসম্ভব অপরের নিকট থেকে খিদমত না নিতে চেষ্টা করবে। বাজে কথা, অসার বাক্য ও গালি-মন্দ করা থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করবে। অতিরিক্ত মজাক-ঠাট্টা করবে না। একে অপরের প্রতি অহমিকা প্রকাশ করবে না। সময়ের যথোচিত সদ্ব্যবহার করা সহ অন্যান্য সৎ গুণাবলী ধারণ করবে।

সাধারণ মুসাফিরের এই আদব ও শিষ্টাচার ছাড়াও খাস হাজীদের মধ্যে বিশেষ গুণ থাকা উচিত। যেমন, প্রতি কাজে ইখলাস (বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর তুষ্টিলাভের ইচ্ছা), আল্লাহ-ভীরুতা (তাকওয়া), আল্লাহর নির্দেশাবলীর যথার্থ সম্মান, অপরকে কষ্ট না দেওয়া, বিশেষ করে তওয়াফ (কা’বা শরীফ প্রদক্ষিণ), সায়ী (সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে যাওয়া-আসা) ও রমই জিমার (পাথর মারা) কালে ভিঁড়ের চাপে নিজেকে সামলে নেওয়া এবং ধাক্কায় অপরকে কষ্ট না দেওয়া, অজ্ঞ মানুষ (যেমন যারা কাঁধ বের করে নামায পড়ে, অসময়ে পাথর মারে তাদেরকে) সঠিক জ্ঞান দান করা, হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে তার ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া বা পথ নির্দেশ করা। হজ্জের সকল অনুষ্ঠানে কেবল আল্লাহরই তা’যীম হৃদয়ে-মনে-মুখে রাখা, হজ্জ পালনে ও সর্বকাজে সুন্নাহর অনুসরণ

করা। ইত্যাদি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মুসলিমের কোনও আমল কেবল দু'টি কষ্ঠিপাথরে বিচার করে গৃহীত হয়। ইখলাস (কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষবিধান) ও ইত্তেবা (রসূলের অনুসরণ, অর্থাৎ সমস্ত আমল তাঁর নির্দেশ ও পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া); এই দু'য়ের একটির অভাব হলে কোন আমল কবুল হয় না।

মীকাত

মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলাইফাহ্ বা আবইয়ারে আলী, সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য জুহফা বা রাবেগ। নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযেল, সাইল বা ওয়াদী মাহরিম। ইরাক, ইরান ও পূর্বদেশীয়দের জন্য যাতে-ইর্ক। ইয়ামান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, বর্মা প্রভৃতি দেশবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম বা সা'দিয়াহ। এবং এই দেশবাসী ছাড়া যারা এর উপর দিয়ে আসবে তাদের জন্যও উক্ত স্থানগুলো মীকাত। কিন্তু যারা উক্ত মীকাত ও মক্কার মধ্যকার বাসিন্দা তাদের মীকাত তাদের নিজেদের বাসস্থানই। তদনুরূপ মক্কাবাসীদের মীকাত তাদের আপন-আপন গৃহ। প্রকাশ যে, জিদ্দা কোন বহিরাগতদের জন্য মীকাত নয়।

ইহরাম

উমরার রুক্ন তিনটি; ইহরাম, তওয়াফ ও সায়ী। এর ওয়াজেব দু'টি; মীকাত (উপরোক্ত ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) থেকে ইহরাম বাঁধা এবং মস্তক মুন্ডন বা কেশ কর্তন করা।

হজ্জের রুক্ন চারটি; ইহরাম, আরাফাতে অবস্থান, তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ইফাযাহ ও সায়ী। আর এর ওয়াজেব সাতটি; মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা, জামারাতে পাথর মারা, মস্তক মুন্ডন অথবা কেশ কর্তন করা, মিনায় রাত্রি বাস করা এবং বিদায়ী তওয়াফ করা।

জ্ঞাতব্য যে, হজ্জ বা উমরার কোন রুক্ন বাদ পড়ে গেলে হজ্জ বা উমরাহ হয় না। পুনরায় আগামীতে তাকে হজ্জ বা উমরাহ (ফরয হলে) করতে হয়। কিন্তু কোন ওয়াজেব ছুটে গেলে ফিদ্য়্যাহ লাগে, হজ্জ হয়ে যায়।

হজ্জ বা উমরার প্রথম রুক্ন ইহরাম। যা ঐ ইবাদতে প্রবেশের সঙ্কল্প (নিয়ত) করাকে বুঝানো হয়। আর যা কেবল ইহরামের কাপড় পরারই নাম নয়। যেহেতু মুহরিম (ইহরাম যে বাঁধে) ইহরাম বেঁধে নানাবিধ পোশাক-পরিচ্ছদ, সুগন্ধ, বিবাহ-যৌনাচার প্রভৃতি আরো অনেক বস্তু যা তার জন্য পূর্বে হালাল ছিল তা নিজের উপর হারাম করে নেয়। *(মুফীদুল আনাম ১/৯২)*

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

হাজী অথবা মু'তামির (ওমরাহকারী) যখন মীকাতে (অথবা তার

বরাবর জায়গায়) পৌঁছবে তখন তার জন্য মুস্তাহাব যে, সে অপ্রয়োজনীয় চুল বা লোম ও নখ পরিষ্কার করে নেবে। অবশ্য এটা ইহরামের কোন অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নয়। তবে প্রয়োজনে কর্তব্য নিশ্চয় বটে। (অবশ্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার নিয়ত থাকলে তা করবে না।)

এরপর গোসল করবে। *(দেখুন, তিরমিযী ৮৩০নং, দারেমী ২/৩১, ইবনে খুযাইমা ২৫৯৫নং, ত্বাবারানীর কাবীর ৪৮৬২নং, দারাক্বুতনী২/২২০বাইহাক্বী ৫/৩২, হাকেম ১/৪৪৭, আল-মুমতে' ৭/৬৮)* হায়েয ও নিফাস-ওয়ালী মহিলাও পবিত্রা মহিলার মতই গোসল করে ইহরাম বাঁধবে। যেহেতু হায়েয ইহরামের প্রতিবন্ধক নয়। *(মাজমু ফাতাওয়া ২৬/ ১০৯)*

পুরুষরা দেহে সুগন্ধি লাগাবে, তবে ইহরামের কাপড়ে নয়। সাদা ও পরিষ্কার একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও একটি চাদর এবং চটি বা চপ্পল পরবে। লুঙ্গি না পেলে পায়জামা এবং জুতা না পেলে (চামড়ার) মোজা পরবে। *(বুখারী ১৭৪৬, মুসলিম ১১৭৮নং)*

মহিলা যে কোন কাপড়ে ইহরাম বাঁধতে পারে। তবে যেন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক রঙিন বা সৌন্দর্য-খচিত পোশাক না হয়। কারণ তাতে সওয়াব কমতে থাকবে। মহিলার ইহরামের জন্য কোন নির্দিষ্ট রঙ বা ধরনের কাপড় নেই। 'অরাস' বা জাফরান অথবা অন্য কোন সুগন্ধ মিশ্রিত কাপড়ে ইহরাম বাঁধা যাবে না। আর এতে পুরুষ ও মহিলা সকলেই সমান। *(বুখারী ১৪৬৮, মুসলিম ১১৭৭নং, ফাতহুল বারী ৪/৫২)*

মহিলা নেকাব ও দস্তানা পরবে না। *(বুখারী ১৭৪১নং)* দস্তানা; যা

মহিলারা হাতের পর্দার জন্য ব্যবহার করে তা না পরলেও কাপড় (বোরকা বা চাদর দ্বারা) হাত ঢেকে নেবে। নেকাব; যা চক্ষুদ্বয় বাইরে রেখে চেহারায় বাঁধা হয়। গায়র মাহরাম পুরুষের নজর থেকে বাঁচতে মহিলার জন্য চেহারায় ওড়না বা চাদরের পর্দা রাখা ওয়াজেব এবং চেহারাকে পর্দার কাপড় থেকে দূরবর্তী করা কোন জরুরী নয়। পায়ের মোজা পরতে পারে, বরং তা পায়ের পর্দার জন্য উত্তম।

পুরুষও দস্তানা ব্যবহার করবে না। অনুরূপভাবে বুট বা ঐ জাতীয় জুতা এবং মোজা পরবে না। তবে চটি জুতা না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যায়।

শিশুদের ইহরাম বড়দের মতই। সেলাই করা পোশাক এবং অন্যান্য ইহরামের অবৈধ বস্তু ও কর্মাদি হতে তাকে দূরে রাখা তার অভিভাবকের জন্য ওয়াজেব। যদিও অধিক ভিঁড় ও কষ্টের কারণে ছোটদের হজ্জ ও উমরা না করাই উচিত তবুও সুযোগ বুঝে তাদের অভিভাবক করালে করাতে পারে।

অতঃপর লেবাসাদি পরে যদি ফরয নামাযের সময় হয় তবে (যোহর, আসর বা এশার) দুই রাক্আত (কসর) নামায পড়বে এবং তারপর ইহরাম বাঁধবে। যদি নামাযের সময় না হয় তবে ওযুর সুন্নতের নিয়তে দুই রাকআত সুন্নত পড়বে -যদিও বা সে সময়ে নফল নামায নিষিদ্ধ হয়। এ ছাড়া ইহরামের জন্য কোন নির্দিষ্ট সুন্নত নামায নেই। অবশ্য মীকাত যুলহুলাইফা হলে এখানে নামায পড়া মুস্তাহাব। ইহরামের জন্য নয়; বরং স্থান (ওয়াদিয়ে আকীক) ও তার

বর্কতের জন্য। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ১৫পৃঃ)*

নামায শেষে গাড়িতে বসে মনে মনে উমরার নিয়ত করবে এবং বলবে, '**লাব্বাইকা উমরাহ**।' হজ্জের নিয়ত করবে ও বলবে, '**লাব্বাইকা হাজ্জা**', উভয়ের নিয়ত করে বলবে, '**লাব্বাইকা উমরাতাঁউ অ হাজ্জা**।' '**সুবহানাল্লাহি অল হামদুলিল্লাহি অল্লাহু আকবার, লাব্বাইকা উমরাহ**' বলাও ভাল। *(বুখারী ১৫৫১নং)*

এ সময় '**আল্লাহুম্মা হাযিহী হাজ্জাহ, লা রিয়াআ ফীহা অলা সুমআহ**'- (অর্থাৎ, এটা এমন হজ্জ যাতে কোন লোকপ্রদর্শন নেই, নেই কোন সুনামের ইচ্ছা।) এ দুআও বলা উত্তম। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ১৬পৃঃ)*

মুহরিম রোগ, শত্রুভয় ইত্যাদির কারণে হজ্জ পালন পূর্ণ না হওয়ার আশঙ্কা করলে তার পক্ষে শর্ত লাগানো উত্তম। সে ক্ষেত্রে বলবে, 'যদি কোন অবরোধক আমাকে অবরুদ্ধ করে তবে সেই অবরোধের স্থানই আমার হালাল হওয়ার স্থান।' এই শর্ত শুরুতে লাগালে হজ্জ বা উমরা আদায়ে কোন বাধা এলে এবং হজ্জ বা উমরাহ সম্পন্ন করতে না পারলে মুহরিমের জন্য হালাল হওয়া বৈধ হবে এবং তার উপর কোন কুরবানী আদি ওয়াজেব হবে না। অন্যথায় কুরবানী ওয়াজেব।

তালবিয়াহ

অতঃপর গাড়িতে চড়ে কিবলামুখী হয়ে তালবিয়াহ পাঠ করতে

শুরু করবে। পুরুষ উচ্চস্বরে এবং মহিলা চুপে চুপে পড়বে। অবশ্য ফিতনার ভয় না থাকলে বা গাড়ির ভিতর কেবল মাহারেমের সাথে থাকলে মহিলারাও সশব্দে পড়বে। জামাআতবদ্ধভাবে সমস্বরে একই সঙ্গে অথবা একজনের বলার অনুকরণ করে পড়বে না।

তালবিয়াহ হজ্জের এক নিদর্শন ও প্রতীক। *(আহমাদ ২/৩২৫)* আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক তালবিয়াহ পাঠকারী যখন তালবিয়াহ পাঠ করে, তখন তার ডাইনে ও বামে প্রত্যেক গাছপালা এবং পাথর-মাটিও তালবিয়াহ পড়ে থাকে। *(বাইহাকী ৫/৪৩)*

নবী ﷺ এর পঠিত তালবিয়াহ পড়াই উত্তম;

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ. (لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ)

উচ্চারণঃ- *লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা অন্‌নি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক্‌, লা শারীকা লাক। (লাব্বাইকা ইলা-হাল হাক্ক)*

অর্থঃ- আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই। (আমি হাজির, হে সত্য মা'বূদ!)

এই তালবিয়াহ বেশী বেশী করে পড়বে এবং অন্যান্য যিক্‌র ও দুআ আদিও পাঠ করতে থাকবে। এই তালবিয়ার উপর বাড়তি অন্য কিছু না বলাই উত্তম। তবে এই দুআ বাড়তি বলা যায় ঃ- **لَبَّيْكَ**

ذَا الْمَعَارِجِ، لَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ،

'লাব্বাইকা যাল মাআরিজ, লাব্বাইকা যাল ফাউয়াযিল।'

অর্থাৎ, আমি হাজির, হে সোপানশ্রেণীর মালিক! আমি হাজির, হে বৃহৎ নেয়ামতসমূহের মালিক!

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلِ.

'লাব্বাইক অসা'দাইক, অল্খায়রু বিয়্যাদাইক, অররাগবা-উ ইলাইকা অল্আমাল।'

অর্থাৎ, আমি হাজির, আমি হাজির। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, সকল আগ্রহ ও কর্ম তোমার প্রতি। *(ঐ ১৬পৃঃ)*

মুহরিম যদি কারো প্রতিনিধি হয় তাহলে বলবে, 'লাব্বাইকা উমরাতান' অথবা 'হাজ্জান আন (-----)।' এবং 'আন' বলে আসল কর্তার নাম নেবে।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকারের; তামাত্তু, ক্বিরান ও ইফরাদ। সবচেয়ে উত্তম হল তামাত্তুর ইহরাম বাঁধা। তামাত্তুর অর্থ; হজ্জের মাসে প্রথমে কেবল উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা, অতঃপর উমরাহ সেরে হালাল হয়ে পুনরায় ঐ সফরেই হজ্জের ইহরাম বাঁধা। এই ইহরাম বিশেষ করে তাদের জন্য বেশী ভালো যারা বহু পূর্বেই হজ্জের মাসে মক্কা শরীফে পৌঁছে থাকে। যাতে তারা উমরাহ করার পর হালাল হয়ে হজ্জের ইহরাম পর্যন্ত 'তামাত্তু' (ফায়দা) লাভ করে থাকে।

তামাত্তুর বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেহেতু সাহাবাগণ যখন (নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জে গিয়ে) তওয়াফ ও সায়ী শেষ করলেন, তখন তিনি যাঁরা সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) এনেছিলেন তাঁদেরকে ছাড়া সকলকে উমরাহ (গণ্য) করে তামাত্তু করতে আদেশ করলেন। যেহেতু তিনি নিজে সঙ্গে হাদী এনেছিলেন, তাই উমরাহ গণ্য না করে হজ্জের অপেক্ষা করলেন এবং তামাত্তু না করতে পেরে আফসোস করলেন। অতএব তামাত্তু উত্তম বলেই তাঁদেরকে এই আদেশ করেছিলেন এবং নিজেও তামাত্তু করার জন্য আফসোস করেছিলেন। বলেছিলেন, "যদি হাদী না আনতাম তাহলে আমি উমরাহ করতাম এবং হালাল হয়ে যেতাম।"

অধিকন্তু তামাত্তু হজ্জে আমল অধিক থাকে, তাতে পৃথকভাবে পূর্ণ উমরাহ থাকে এবং পূর্ণ হজ্জেরও আমল থাকে।

তামাত্তু হজ্জে ফায়দা লাভের শুকরিয়া হিসাবে এবং দুই সফরের এক সফর সংক্ষিপ্ত হবার শুকরানার জন্য হাদী (কুরবানী) ওয়াজেব। যদি হাজী তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে (ঈদের পর পর) ৩ দিন এবং বাড়ি ফিরে ৭ দিন সর্বমোট ১০ দিন রোযা পালন করবে। *(কুঃ ২/১৯৬)*

এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করে ইহরাম বাঁধলে অথবা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে পরে ঐ সঙ্গে হজ্জ করলে ক্বিরান হজ্জ হয়। ক্বিরান হজ্জের হাজীর উপরও কুরবানী ওয়াজেব। না পারলে ঐরূপ দশ দিন রোযা পালন করতে হবে।

কেবলমাত্র হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধলে ইফরাদ হজ্জ হয়। এই হজ্জে কুরবানী ওয়াজেব নয়।

যে ব্যক্তি ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধে, অথবা ক্বিরান হজ্জের ইহরাম বাঁধে কিন্তু সঙ্গে হাদী আনে না তার জন্য উত্তম যে, মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরাহ করে (তওয়াফে কদুম ও সায়ী করে এবং চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর ইহরাম খুলে দিয়ে পুনরায় তারবিয়ার দিনে (৮ই যুল হজ্জ) হজ্জের ইহরাম বাঁধবে; অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ করবে। অনেকে এরূপ করাটাকে ওয়াজেব বলেছেন। *(যাদুল মাআদ ২/ ১৮৫, মুফীদুল আনাম ১/ ১৩০)*

ইহরামে অবৈধ

ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য যা কিছু করা অবৈধ তা সাধারণতঃ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার অবিধেয় যা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সাধারণ এবং তা ৮ রকম;

১। মুন্ডন বা অন্য কোন প্রকারে মস্তকের কেশ দূরীকরণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত না হয় তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না। *(কুঃ ২/ ১৯৬)*

তদনুরূপ দেহের মধ্যে কোন প্রকারের লোম তোলা বা ছিঁড়া মুহরিমের জন্য অবৈধ।

২। হাত অথবা পায়ের নখ তোলা বা কাটা। যেহেতু এটাও দেহের কোন অংশ দূর করা; যাতে বিলাসিতা লাভ হয়।

৩। শরীর, বস্ত্র, খাদ্য অথবা পানীয়তে সুগন্ধি ব্যবহার করা। *(বুখারী ১২০৬, মুসলিম ১২০৬নং)*

৪। দস্তানা বা হাতমোজা ব্যবহার করা।

৫। স্বামী-স্ত্রীর কামজ আলিঙ্গন, চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি যৌনাচার।

এই পাঁচটি অবৈধ কর্মের মধ্যে কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এখতিয়ারের সাথে তিন প্রকার 'ফিদ্য়্যাহ' (জরিমানা) আছে। যেমন আল্লাহপাক মস্তক মুন্ডনের ব্যাপারে বলেন, "অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে পরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদ্য়্যা দিবে।" *(কুঃ ২/ ১৯৬)*

সুতরাং এই জরিমানা আদায়ে এখতিয়ার আছে। ইচ্ছা করলে তিন দিন রোযা পালন করবে কিংবা ছয়টি মিসকীন (নিঃস্ব)কে মাথা পিছু অর্ধ সা' (সওয়া এক কিলো) করে খাদ্য (চাল) দান করবে অথবা একটি ছাগ বা মেষ কুরবানী দিবে। (আর এই খাদ্য ও মাংস হারাম শরীফের মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে হবে।) যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ কা'ব বিন উজরাহকে বলেছিলেন, "সম্ভবতঃ তোমার মাথার উকুণগুলি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?" বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা ছয়টি মিসকীন খাওয়াও, কিংবা একটি ছাগ কুরবানী কর।" *(বুখারী ১৮১৪, মুসলিম ১২০১নং)*

আর মস্তক মুন্ডনের উপর নখ কাটা, মোজাদি পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও যৌনাচার করাকে কিয়াস করা হয়েছে। যেহেতু এগুলিও বিলাসিতার মধ্যে পড়ে; যা ইহরাম অবস্থায় অবৈধ।

৬। যোনিপথে সহবাস করা। সহবাস যদি প্রথম হালাল [১] হওয়ার পূর্বে হয় তাহলে হজ্জই নষ্ট হয়ে যাবে। তবুও হাজী বাকী আমল শেষ করবে। একটি উট অথবা গরু কুরবানী করবে এবং পরের বছরে পুনরায় নতুন করে কাযা হজ্জ করবে। স্ত্রী সহবাস ব্যতীত কোন এমন অবৈধ কাজ নেই, যা প্রথম হালালের পূর্বে ইহরাম বিনষ্ট করে ফেলে। তাই এটা সবচেয়ে বড় অবৈধ কর্ম; যাতে বড় কাফ্‌ফারা ও কাযা জরুরী করা হয়েছে।

৭। বিবাহ। মুহরিম নিজে বিবাহ করতে পারবে না এবং অপরের অভিভাবক বা উকীল হয়ে বিবাহ দিতেও পারবে না এবং পয়গামও দিবে না। অবশ্য এই অবৈধ কাজ করে ফেললে কোন ফিদ্‌য়্যাহ নেই, কিন্তু বিবাহ শুদ্ধ হবে না। *(মুসলিম ১৪০৯নং)*

৮। অগৃহপালিত স্থলচর পশু যবেহ বা শিকার করা। আল্লাহ পাক বলেন "হে মুমিনগণ! ইহরামে থাকা কালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার মীমাংসা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য

---

(১) *কুরবানীর দিন পাথর মেরে কেশ মুন্ডন অথবা কর্তন করার পর প্রথম হালাল হয়; যাতে স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায়।*

কুরবানীরূপে। (যার মাংস হারামের ফকীরদের মাঝে বন্টন করা হবে।) অথবা ওর বিনিময় হবে দরিদ্রকে (ওর সমপরিমাণ) অন্নদান, কিংবা সমপরিমাণ রোযা পালন করা, (প্রতি মিসকীনের পরিবর্তে একটি রোযা)। যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন, আর কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" *(কুঃ ৫/৯৬ আয়াত)*

অনুরূপভাবে শিকার কার্যে সাহায্য করা এবং হারামের কোন শিকারকে তার স্থান হতে তাড়িত ও চকিত করা বৈধ নয়। হারামের গাছ ও ঘাস কাটা, প্রচার ও ফিরতের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পরিত্যক্ত মাল কুড়ানো অবৈধ।

প্রকাশ থাকে যে, মিনা ও মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত। আরাফাত হারামের মধ্যে নয়।

ইহরামে অবিধেয় কর্মসমূহের দ্বিতীয় প্রকার যা কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, তা দুই রকম ঃ-

১। মস্তক সংলগ্নে কোন আবরণ (যেমন; টুপী, পাগড়ী ইত্যাদি শিরস্ত্রাণ) ব্যবহার করা। কিন্তু যা মস্তকের সংলগ্ন নয় বা মাথার সঙ্গে লেগে থাকে না এমন কোন আবরণ বা আচ্ছাদন (যেমন, ছাদিত গাড়ি, তাঁবু, পল্লবিত বৃক্ষ, ছাতা ইত্যাদি) ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তদনুরূপ, মাথায় কোন বোঝা তোলা বা বহন করা (যদি মাথা ঢাকার নিয়তে না হয় তবে) দূষণীয় নয়। *(মুসলিম ১২৯৮নং)*

২। কোন প্রকারের সেলাইকৃত বস্ত্র পরিধান করা যেমন; জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি। অবশ্য আংটি, চশমা, ঘড়ি, বেল্ট, অর্থাদি রাখার ব্যাগ ইত্যাদি (সেলাইকৃত হলেও) ব্যবহার করতে পারা যায়।

অবিধেয় কর্মসমূহের তৃতীয় প্রকার যা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। আর তা হচ্ছে কোন প্রকারে চেহারা আবৃত করা। কিন্তু কোন বেগানা পুরুষ সামনে এলে চেহারা আবৃত করা ওয়াজেব। যা অন্যান্য সাধারণ দলীলাদি সাব্যস্ত করে।

এই অবিধেয় কর্মগুলির কোন একটায় জড়িয়ে পড়লে তার কাফ্ফারাও পূর্বেকার মত। পক্ষান্তরে যারা এই সমস্ত অবিধেয় কর্মে আলিপ্ত হয় তাদের তিন অবস্থা হতে পারে;

১। কেউ বিনা ওজর ও বিনা প্রয়োজনে করে। এই অবস্থায় সে গোনাহগার হবে এবং তার উপর ফিদ্য়্যা ওয়াজেব; যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

২। কেউ কোন প্রয়োজন ও অসুবিধায় পড়ে করে। এমতাবস্থায় সে গোনাহগার হবে না তবে তার জন্য ফিদ্য়্যা দেওয়া জরুরী হবে। যেমন কেউ যদি মাথায় ঘা অথবা জখমের কারণে চুল কাটে অথবা প্রচন্ড শীতের জন্য মাথা ঢাকে ইত্যাদি। *(মজমূ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/১১৩)*

৩। কেউ অজান্তে ভুলে, কারো তরফ থেকে বাধ্য হয়ে অথবা নিদ্রাবস্থায় করে ফেলে। এমতাবস্থায় তার উপর গোনাহ নেই এবং

ফিদ্য়্যাও নেই। কিন্তু যখনই এই সমস্ত ওজর ও আপত্তি দূর হয়ে যাবে তখনই ঐ অবৈধ কাজ পরিত্যাগ করা জরুরী হবে। আল্লাহ পাক বলেন,

(رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। *(কুঃ ২/২৮৬)* আর তাঁর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃত এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয় তার (পাপ)কে অতিক্রম (ক্ষমা) করেন।" *(ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং)* অতএব যে ইহরাম অবস্থায় ভুলে পায়জামা বা গেঞ্জি পরে নেয়, কিংবা মাথা ঢেকে নেয় অথবা অজান্তে নখ ইত্যাদি কেটে ফেলে তবে তার কোন পাপ নেই এবং ফিদ্য়্যাও নেই। কিন্তু স্মরণ হওয়া মাত্র তার পক্ষে ওয়াজেব তা বর্জন করা।

মুহরিম গা-মাথা ধুতে পারে, চুলকাতে পারে। যদি তাতে দু' একটা চুল খসেও পড়ে তবে তা দূষণীয় নয়। তদনুরূপ ইহরাম বাঁধার পূর্বে দেহে ব্যবহৃত সুগন্ধির অবশিষ্ট কিছু যদি ইহরাম অবস্থায় হাতে লেগে যায় তবে তাও দোষের নয়। যেমন তার জন্য ইহরামের কাপড় পরিষ্কার ও পরিবর্তন করাও বৈধ। *(ফতহুল বারী ৩/৪০৫)*

অবশ্য সুগন্ধময় সাবান, তেল ও ক্রিম ব্যবহার না করাই উচিত।

প্রকাশ যে, হজ্জে যে ভুলে বা ওয়াজেব ত্যাগে ফিদ্য়্যা জরুরী সেই কাজ কয়েকটি করে ফেললে শেষে একটি ফিদ্য়্যাই যথেষ্ট হবে।

(মাজাল্লাতুল বুহূসুল ইসলামিয়াহ ২৩/৯৪)

উমরাহ ও হজ্জের পদ্ধতি

মুহরিম যখন মক্কার নিকট পৌঁছবে তখন প্রবেশের পূর্বে তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। মক্কায় প্রবেশ করে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না হয়ে সোজা কা'বা শরীফের প্রতি রওনা দেওয়া উচিত। ওযু করে হারামের মসজিদে (অনুরূপ প্রতি মসজিদেই) প্রবেশের সময় ডান পা আগে বাড়ানো এবং '**বিসমিল্লাহ, অস্-স্বালাতু অস্-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আউযু বিল্লাহিল আযীম, অবি অজহিহিল কারীম অ সুলত্বানিহিল ক্বাদীম, মিনাশ শাইত্বানির রাজীম**।' অথবা '**আল্লাহুম্মাফ্ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক**' বলা সুন্নত। প্রকাশ থাকে যে, মসজিদুল হারাম প্রবেশের সময় এ সাধারণ দুআ ছাড়া ভিন্ন কোন নির্দিষ্ট দুআ নেই।

অতঃপর কা'বা নজরে পড়লে দুই হাত তুলতে পারে, তবে কা'বা দর্শনের সময় কোন পঠনীয় দুআ শুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অবশ্য এই সময় হযরত উমর ﷺ-এর দুআ '**আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম, অমিন্কাস সালাম, ফাহাইয়্যিনা রাব্বানা বিসসালাম**' পড়া উত্তম। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ২০পৃঃ)*

১। অতঃপর কাবা শরীফের নিকট পৌঁছনর পর তালবিয়াহ বন্ধ করবে (যদি উমরা অথবা তামাত্তু হজ্জ করে তবে) এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায না পড়ে তওয়াফ শুরু করবে। তবে যদি ফরয নামাযের সময় যাবার ভয় থাকে অথবা জামাআত ছুটার ভয় থাকে তাহলে ঐ নামায পড়ে তওয়াফ করবে। সর্বাগ্রে হাজারে আসওয়াদের নিকট যাবে এবং তা চুম্বন করবে। সম্ভব হলে তার উপর (আল্লাহকে) সিজদা করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ডান হাত লাঠি দ্বারা স্পর্শ করে হাতে চুমা দেবে। যদি লাঠি না থাকে অথবা ভিঁড়ের চাপে তা সম্ভব না হয়, তাহলে ডান হাত দ্বারা পাথরের প্রতি ইশারা করবে। তবে ইশারা করে হাত চুমবে না এবং নামাযে তকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলার মত দুই হাত তুলবে না। এই সময় বলবে, '**বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার**।'

এ সব কিছু পাথরের তা'যীমের উদ্দেশ্যে নয়; বরং উদ্দেশ্য কেবল মহামহিমান্বিত আল্লাহর সন্তোষবিধান এবং এ কাজে প্রিয় রসূল ﷺ-এর সরল অনুসরণ। যার ফলে হাজীর পাপক্ষয় হয়।

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দেওয়া হজ্জ বা তওয়াফের কোন অঙ্গ নয়। তাই চুম্বন কোন জরুরী কাজও নয়। বর্কতের লাভে স্পর্শও বিদআত এবং আল্লাহর ডান হাত মনে করাও সঠিক নয়। কারণ, এ বিষয়ের হাদীসটি মনগড়া অথবা দুর্বল। *(যয়ীফুল জামে' ২৭৭১, ২৭৭২নং)* সুতরাং তার জন্য ভীড় জমানো অথবা ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি করা মোটেই বৈধ নয়।

অতঃপর কা'বা শরীফকে বাম দিকে করে তওয়াফ শুরু করবে। বিভিন্ন দুআ, যিক্র বা তেলাঅত দ্বারা তওয়াফে বিনয়, একাগ্রতা, শুদ্ধচিত্ততা ও (কা'বার নয় বরং) আল্লাহর তা'যীমের সাথে মনোনিবেশ করবে। অধিক এদিক ওদিক তাকাতাকি করবে না ও কথাবার্তা বলবে না -যদিও তা বৈধ।

তওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই। আবার প্রতি চক্করের জন্য এক এক দুআ নির্দিষ্ট করারও কোন ভিত্তি নেই। যেমন, যে দুআ পড়বে তা নিশ্চুপে পড়বে এবং উচ্চরবে পড়ে অপর তওয়াফকারীদের ডিস্টার্ব করবে না।

যখন (হাজারে আসওয়াদের আগের কোণ) রুক্‌নে ইয়ামানীর বরাবর পৌছবে তখন সম্ভব হলে ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করবে এবং বলবে, '**বিসমিল্লাহি অল্লাহ আকবার**।' (হাতটিতে চুম্বন দেবে না আর স্পর্শের সময় অন্য দুআও বলবে না, কারণ এ ক্ষেত্রে দুআর হাদীসটি যয়ীফ। *(যয়ীফুল জামে' ৬১২৭নং)* যদি স্পর্শ সম্ভব না হয় তবে ইশারা করবে না এবং তকবীরও বলবে না। বরং সাধারণভাবে অতিক্রম করে যাবে। অতঃপর এই রুক্‌নে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে মুনাজাতের এই দুআ বলবে,

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

'রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়্যা হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাহ, অক্বিনা আযা-বান্না-র।'

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পার্থিব জীবনে কল্যাণ দাও এবং পারলৌকিক জীবনেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

অতঃপর হাজারে আসওয়াদের বরাবর (সবুজ বাতি) এলে এক চক্কর শেষ হবে এবং সেই সাথে শুরু হবে দ্বিতীয় চক্কর। এখানে এসে একবার '**আল্লাহু আকবার**' বলবে এবং হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে না পারলে স্পর্শ করবে। তা সম্ভব না হলে কেবল ডান হাত দ্বারা ইশারা করেই (এবং হাত চুম্বন না করেই) অতিক্রম করবে। যেমন সেখানে (বাতি বা দাগের নিকট) থেমে ভিঁড় বাড়ানোও উচিত নয়। খেয়াল করবে যেন হাতীমের [১] বাইরে থেকে তওয়াফ হয়। আর এইভাবে সাত চক্কর শেষ করবে। শেষ চক্করে হাজারে আসওয়াদের কাছে এসে আর তকবীর দিয়ে ইশারা করবে না।

মক্কা আগমনের পর সর্বপ্রথম এই তওয়াফটির নাম তওয়াফে কুদূম। এই তওয়াফে দুটি কাজ সুন্নত।

১। ইয্‌তিবা, অর্থাৎ চাদরের মাঝখানটাকে ডান বগলের নীচে রাখবে এবং কিনারাটাকে বাম কাঁধের উপর চাপিয়ে দেবে। এতে ডান কাঁধটি বীরদের মত খোলা থাকবে। যাতে ইবাদতস্থলে বলবত্তা ও কর্মণ্যতা প্রকাশ পায়।

অতএব তওয়াফে কুদূম শুরু করার পূর্ব হতে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে ইয্‌তিবা সুন্নত। ইহরাম বাঁধার পর থেকে নিয়ে হজ্জের

(১) *হাতীম কা'বাগৃহের উত্তর-পশ্চিম কোণে ত্যক্ত অংশ; যা গোলাকার দেওয়াল দ্বারা ঘিরা আছে। একে হিজ্‌রও বলা হয়।*

সর্বশেষ ইহরাম খোলা পর্যন্ত সময় ধরে (এমন কি নামাযের মধ্যেও!) ডান কাঁধটিকে খোলা রাখার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই; যেমন বহু হাজী তা করে থাকে। বরং ঐভাবে নামায শুদ্ধ হয় না।

২। রমল। অর্থাৎ ছোট পদক্ষেপের সাথে শীঘ্র (কুচকাওয়াজী) চলা। কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হয়ে তওয়াফ আফযল। কিন্তু দূরবর্তী হয়ে রমল করা, নিকটবর্তী হয়ে তওয়াফ করতে গিয়ে ভিঁড়ে তা ত্যাগ করা থেকে উত্তম।

কেবলমাত্র তওয়াফে কুদূম (বা তওয়াফে ওমরাহ) এর প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত। অন্য কোন তওয়াফ বা চক্করে নয়। যদি প্রথম তিন চক্করে কোন অসুবিধার কারণে রমল ছুটে যায় এবং চতুর্থ বা তার পরবর্তী চক্করে রমল করার সুযোগ হয়, তবে তা কাযা করবে না। যাতে ঐ চক্করগুলির নির্দিষ্ট গুণ বিনষ্ট না হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্রথম তিন চক্করের মধ্যে এক অথবা দুই চক্করে রমলের সুযোগ হলে তাও করে নেবে।

তওয়াফ করাকালে যদি ফরয নামাযের ইকামত হয়ে যায় তবে তওয়াফ ছেড়ে জামাআতে ও নামাযে শামিল হয়ে যাবে এবং নামায পড়ে ঠিক যেখানে ছেড়ে ছিল ঠিক সেখান থেকেই বাকী চক্কর পুরো করবে। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/২২৮)*

চক্কর গণনায় সন্দেহ হলে নিশ্চিতের উপর ভিত্তি করবে। আর নিশ্চিত হবে কমতির উপর। সুতরাং যদি সন্দেহ হয় যে, ছয় চক্কর হল অথবা সাত; তবে ছয় ধরে নেবে। তদনুরূপ সায়ীর চক্করেও

করবে।

তওয়াফ শেষ হলে চাদর সিধা করে নেবে। অর্থাৎ দুই কাঁধই ঢেকে নেবে। এরপর আর কোন সময়ে কাঁধ বের করতে হবে না। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীম [৩] এর নিকট পৌঁছে পড়বে,

(وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلّى)

'অত্তাখিযূ মিম মাক্বা-মি ইব্রা-হীমা মুসাল্লা।'

তারপর এর পশ্চাতে দুই রাকআত 'তাহিয়্যাতুত ত্বাওয়াফ' (তওয়াফের নামায) আদায় করবে। ভিঁড়ের কারণে 'মাক্বাম' থেকে কাছে অথবা পশ্চাতে সম্ভব না হলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নেবে। এই নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর 'কুল ইয়্যা আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' ও দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করা সুন্নত।

ঠিক তওয়াফ শেষ হওয়ার পরেই যদি কোন ফরয অথবা সুন্নত নামায পড়ার থাকে ও পড়ে তাহলে তওয়াফের দুই রাকআত আর পড়তে হবে না। *(মুফীদুল আনাম ১/৩০৭)*

তওয়াফ করে ২ রাকআত নামায পড়লে একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান সওয়াব লাভ হয়। *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৫নং)*

প্রকাশ যে, এই নামায লম্বা করে পড়া এবং নামাযের শেষে হাত

---

(3) *কা'বা শরীফের পূর্ব-উত্তর পার্শ্বে স্থিত গম্বুজাকার কাঁচ-নির্মিত একটি ছোট ঘর, যার মধ্যে পাথরের উপর হযরত ইব্রাহীম ﷺ এর পদচিহ্ন রক্ষিত আছে।*

তুলে মুনাজাত বিধেয় নয়। *(আলমু'তামির অলহাজ্জ---, ইবনে উসাইমীন ৪০পৃঃ)* এ ছাড়া মাকামে ইব্রাহীম স্পর্শ করা, ছুঁয়ে বর্কত নেওয়া বা গায়ে-মাথায় হাত বুলানো ইত্যাদি বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কা'বা শরীফের গেলাফ বা অন্যান্য দেওয়ালাদি স্পর্শ করে তাবার্রুক গ্রহণ, মদীনা শরীফে নববী হুজরা, মিম্বর বা মিহরাব স্পর্শ ও চুম্বন করে তাবার্রুক গ্রহণ, মক্কা ও মদীনা শরীফের মাটি দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ, কা'বা ও মদীনার মসজিদের 'মীযাব' (ছাদ থেকে পানি পড়ার নল) হতে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির পানি গায়ে নিয়ে তাবার্রুক গ্রহণ, মীযাবের নিচে কোন নির্দিষ্ট দুআ পাঠ ইত্যাদিও অবৈধ। *(মাজমূ ফাতাওয়া ২৬/১২১)*

পক্ষান্তরে কেউ চাইলে হাজারে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী দেওয়ালে (মুলতাযামে) বুক, চেহারা, হাত ও বাহু রেখে আল্লাহর নিকট দুআ করতে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ভিক্ষা করতে পারে। তওয়াফে বিদা' বা তার আগে পরে যে কোন সময়ে করতে পারে। দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়েও দুআ করা যায়। *(মানাসিকুল হাজ্জ, ইবনে তাইমিয়্যাহ ৩৮৬পৃঃ, আলবানী ২৩পৃঃ)* এ ছাড়া অন্য কোথাও (যেমন মীযাবের নিচে, যমযমের নিকট ইত্যাদি স্থানে) দুআ কবুল হওয়ার কথা মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ দলীল সাপেক্ষ।

পায়ে চলে তওয়াফ করাই আসল। তবে যদি বার্ধক্য বা অসুস্থতাজনিত কোন কারণে চলতে সক্ষম না হয় তাহলে কোন

বাহনের সাহায্যে তওয়াফ করলে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

মুসলিম নারীর উচিত, এই তওয়াফ বা বাকী সর্বক্ষণে পর্দা, সম্ভ্রম ও নারীত্বের খেয়াল রাখা। সুতরাং সে তার সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে আবৃত করে পুরুষদের সামনে আসবে। কোন চিত্তাকর্ষী, মনোহারী ও শব্দব্যঞ্জক পোশাক, অলঙ্কার এবং কোন প্রকার সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। মনোরম পরিচ্ছদ ও আভরণাদি বোরকার ভিতরে গুপ্ত রাখবে। যথাসম্ভব পুরুষদের ভিঁড় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের জন্য অথবা রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার জন্য পুরুষদের সাথে পাল্লা দেওয়া তার উচিত নয়। বরং অগণিত পুরুষের সামনে চেহারা খুলে এবং তাদের সাথে ধস্তাধস্তি করে চুম্বন দেওয়াই অবৈধ। যেহেতু কল্যাণ আনয়নের চেয়ে অকল্যাণ অপসারণ করাই অগ্রগণ্য। ইমাম নওবী (রঃ) বলেন, 'আমাদের আসহাবগণ বলেন, রাত্রি ইত্যাদিতে তওয়াফের স্থান খালি না হলে মহিলাদের জন্য হাজারে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করা মুস্তাহাব নয়। কারণ, (ভিঁড়ের মধ্যে তা করতে গেলে) তাদের নিজের ক্ষতি হয় এবং তাদের কারণেই ক্ষতি হয় পুরুষদেরও।' *(ফাতহুল বারী ৩/৪৭৯, শারহুল মুহায্যাব ৮/৩৪)*

সা'ঈ

অতঃপর তওয়াফ ও নামায শেষে যমযমের পানি পান করবে ও মাথায় নেবে। অতঃপর সম্ভব হলে তকবীর পড়ে হাজারে

আসওয়াদ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ বা ইশারা করে সাফা পর্বতের দিকে অগ্রসর হবে। পর্বতের নিকট পৌঁছে পাঠ করবে,

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ)*(কুঃ ২/১৫৮)*

অতঃপর '**আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহ**' বলে সাফার উপর চড়ে কেবলামুখ হবে এবং কা'বা দেখার চেষ্টা করবে। আল্লাহর তওহীদ বর্ণনা করবে ও তকবীর পড়বে এবং এই দুআ বলবে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ (لاَ شَرِيْكَ لَهُ) أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়্যী অয়্যুমীতু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু (লা শারীকা লাহ), আনজাযা ওয়া'দাহ, অনাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযাবা অহদাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি সর্বমহান। আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সারা রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, (তাঁর কোন শরীক নেই।) তিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য

করেছেন এবং তিনি এককভাবে শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।

এই সাথে যথাসম্ভব হাত তুলে দুআ (মুনাজাত) করবে। (কিন্তু দুআ শেষে হাত মুখে ফিরাবে না। যেহেতু হাত তুলে দুআর শেষে মুখ মাসাহ করার প্রমাণে কোন সহীহ বা হাসান হাদীস নেই। যেমন তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলার মত হাত তুলে কা'বার প্রতি ইঙ্গিত করা ভুল।)

এইরূপ তকবীর ও দুআ ৩বার পাঠ করবে। অতঃপর সেখান থেকে নেমে মারওয়া পর্বতের প্রতি চলতে শুরু করবে। যখন সবুজ প্রতীকের (লাইটের) নিকট পৌঁছবে তখন পরবর্তী প্রতীক পর্যন্ত যথাসম্ভব দৌড় দেবে বা সবেগে চলবে। কিন্তু মহিলারা সাধারণভাবে চলেই তা অতিক্রম করবে। আশেপাশে কোন বেগানা পুরুষ না থাকলে দৌড় দেবে। অতঃপর সাধারণ গতিতে চলে মারওয়ার নিকট পৌঁছে সা'ঈর প্রথম চক্র শেষ করবে। পর্বতের উপর চড়ে কেবলামুখ হবে এবং সাফায় যেভাবে দুআ আদি পড়েছিল তাই এখানেও পড়বে। (কেবল আয়াতটি পড়বে না।) অতঃপর সেখান হতে নেমে সাফার প্রতি যাত্রা করবে। পূর্বে চক্রের মত এ চক্রেও সাধারণ চলার স্থানে চলবে এবং দৌড়ের স্থানে দৌড়বে। এইভাবে সাফার নিকট পৌঁছে দ্বিতীয় চক্র সমাপ্ত করবে। সাফায় চড়ে আর ঐ আয়াত পড়বে না। কিন্তু ঐ দুআ ও মুনাজাত পূর্বের মতই করবে।

সা'ঈর মাঝে সাধ্যমত যিক্র ও তেলাঅত করবে। প্রকাশ যে, সা'ঈর জনও নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই। তবে এতে

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَم.

'**রাব্বিগফির অরহাম ইন্নাকা আন্তাল আআয্যুল আকরাম**' দুআটি বলা যায়। এটি ইবনে মাসউদ ﷺ ও ইবনে উমার ﷺ পাঠ করতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

অনুরূপ ৭ বার যাতায়াত করে মারওয়ার নিকট পৌঁছে সা'ঈর সাত চক্র শেষ করবে। তওয়াফে হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্তই এক চক্কর হয়। কিন্তু সা'ঈতে সেরূপ নয়। এতে সাফা থেকে শুরু করে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্র এবং পুনরায় মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত আর এক চক্র হয়। আর এইভাবে ৭ বার যাওয়া ও আসার মাধ্যমে সা'ঈ পূর্ণ হয়।

জানার বিষয় যে, সা'ঈর জন্য পবিত্রতা ও ওযু মুস্তাহাব, (ওয়াজেব নয়)। সুতরাং তওয়াফের পর সা'ঈর পূর্বে বা মাঝে (মহিলাদের) অপবিত্রতা দেখা দিলে অথবা ওযু নষ্ট হয়ে গেলেও সা'ঈ পুরো করে নেওয়া জায়েয হবে।

সা'ঈ সমাপ্তির পর মাথা নেড়া বা চুল খাটো করবে। তবে নেড়া করাই আফযল। কিন্তু তামাত্তু হজ্জ করলে চুল ছোট করে নেওয়া ভালো। যাতে কুরবানীর দিন নেড়া করতে পারে। অবশ্য হজ্জের জন্য যথেষ্ট সময় থাকলে চুল বের হয়ে যাবে মনে হলে নেড়া করে নেবে। পরন্তু মাথায় কোন চুল না থাকলে তা ওয়াজেব নয়। মাথায় ক্ষুর বুলানোও বিধেয় নয়। মহিলারা চুলের ডগা হতে কেবল একটি আঙ্গুলের ডগা বরাবর মত চুল কেটে ফেলবে। খেয়াল রাখবে, যাতে

বেগানা পুরুষ তা না দেখে।

মাথা নেড়া বা চুল কাটার সময় মাথার কিছু অংশ থেকে চুল নেওয়া যথেষ্ট নয়। নেড়া করলে পুরো মাথা করবে, ছাঁটলেও পুরোটা ছাঁটবে। কিছু অংশ চেঁছে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা বৈধ নয়। চাঁচতে বা ছাঁটতে নিজের (হাজীর) ডান থেকে শুরু করবে।

এই পর্যন্ত করলে উমরাহ শেষ হয়ে যায় এবং মুহরিম হালাল হয়ে যায় ও সব কিছু (লেবাস, সুগন্ধি, স্ত্রীসঙ্গম ইত্যাদি) তার জন্য বৈধ হয়ে যায়।

কিন্তু যদি কেউ সঙ্গে হাদ্ই (কুরবানী) এনে ক্বিরান হজ্জ করতে চায় তাহলে সে হালাল না হয়ে ইহরামেই থাকবে। তবে যে ব্যক্তি সঙ্গে হাদ্ই না এনে ক্বিরান করতে চায় বা ইফরাদ হজ্জ করতে চায় তার জন্য উমরাহ করে হালাল হয়ে গিয়ে তামাত্তু হজ্জ করাই সুন্নত। সুতরাং যদি সে উমরাহ করে হালাল হয়ে যায় তবে তামাত্তু হজ্জের মত সব কিছু করবে। আর ইহরামেই থেকে গেলে তাওয়াফে ইফাযার পর আর দ্বিতীয় সা'ঈর প্রয়োজন হবে না।

উমরার ইহরাম বাঁধার পর যদি কোন স্ত্রীলোকের ঋতু (হায়েয বা নেফাস) শুরু হয়ে যায়, তবে মক্কা শরীফে প্রবেশের পর পবিত্রা না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফ ও সা'ঈ করবে না। পবিত্রা হলে উমরাহ সম্পন্ন করবে। কিন্তু কোন মহিলা যদি আরাফার আগের দিন পর্যন্ত পবিত্রা না হয় তাহলে অন্যান্য হাজীদের মত সেও ইহরাম বেঁধে মিনা যাত্রা করবে এবং উমরাহ না করতে পেরে সে এক প্রকার

ক্বিরান হজ্জ করবে। হাজীরা যেরূপ করে ঠিক তদনুরূপ আরাফায় অবস্থান মুযদালিফায় ও মিনায় রাত্রিবাস, পাথর মারা ও কুরবানী করা, চুলের ডগা কাটা ইত্যাদি কর্ম করবে। এরপর যখন পবিত্রা হবে তখন একবার তওয়াফ ও একবার সায়ী করবে এবং তা তার উমরাহ ও হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে।

প্রকাশ যে, মহিলা ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করে হজ্জ সমাধা করতে পারে।

হজ্জের করণীয়

৮ই যুলহজ্জ

আটই যুলহজ্জ তারবিয়ার দিন (যাদের ইহরাম নেই তারা) নিজ নিজ বাসাতেই (এবং মিনায় থাকলে মিনাতেই) নতুনরূপে গোসল করে দেহে খোশবু লাগিয়ে ও ইহরামের লেবাস পরে হজ্জে প্রবেশ হওয়ার নিয়ত করবে এবং বলবে, '**আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জা। লাব্বাইকাল্লাম্মা লাব্বাইক**----।' নায়েবরা পূর্বের মতই বলবে, '**লাব্বাইকা হাজ্জান আন** (ফুলান)' এবং যার নামে হজ্জ করছে 'ফুলান'-এর স্থলে তার নাম নেবে।

তালবিয়া খুব বেশী বেশী করে পাঠ করবে এবং এই তালবিয়া চলবে ১০ তারীখে জামরাহ আক্বাবাতে পাথর মারা পর্যন্ত।

অতঃপর মক্কা শরীফ থেকে মিনার প্রতি যাত্রা করবে। সেখানে

যোহর, আসর, মাগরিব এশা এবং ফজরের নামায (মাগরিব ও ফজর ছাড়া) কসর করে স্ব-স্ব সময়ে আদায় করবে।

৯ই যুলহজ্জ

৯ই যুলহজ্জের যখন সূর্যোদয় হবে তখন হাজী তকবীর ও তালবিয়ার সাথে আরাফার প্রতি যাত্রা করবে। সম্ভব হলে 'নামেরা'তে (আরাফার পূর্বে একটি স্থানের নাম যেখানে মসজিদে নামেরাহ অবস্থিত সেখানে) অবস্থান করবে। অতঃপর সূর্য ঢলে গেলে 'বাত্বনে উরানা'য় প্রবেশ করবে। অতঃপর এক আযান ও দুই একামতে যোহর ও আসরের নামায জমা ও কসর করে আদায় করবে। এখানে ইমাম খুৎবা দেবেন। অতঃপর হাজী আরাফাতে প্রবেশ করে অকুফ (অবস্থান) করবে। অত্যাধিক ভিঁড়ের কারণে 'নামেরাহ' বা 'উরানা'য় অবস্থান সম্ভব না হলে সরাসরি আরাফায় গিয়ে অবস্থান দূষণীয় নয়।

আরাফার ময়দানে প্রবেশ করার পর বিভিন্ন ফলক-সঙ্কেত লক্ষ্য করে তার সীমার ভিতরে আছে কিনা তা জেনে সুনিশ্চিত হবে। কারণ সঠিকভাবে আরাফায় অবস্থান ব্যতীত হজ্জই হবে না। আরাফাতের ময়দানে যে কোন স্থানে অবস্থান করা যাবে। 'বাত্বনে উরানাহ' আরাফাতের মধ্যে নয়। মসজিদে নামেরার কেবলার দিকে প্রায় অর্ধেকাংশ আরাফার মধ্যে গণ্য নয়। অতএব যারা মসজিদে অবস্থান করবে তাদেরকে কেবলার দিক ছেড়ে পশ্চাৎ দিকে অবস্থান করা উচিত। অবশ্য চারিপাশে আরাফাতের সীমা নির্দেশক ফলক

স্থাপিত আছে তা দেখে আরাফাত চিহ্নিত করা শিক্ষিতদের পক্ষে খুবই সহজ।

সম্ভব হলে জাবালে আরাফাহ (লোকমুখে প্রচলিত ঃ জাবালে রাহমাহ; আরাফাতের এক পর্বত)কে সম্মুখে রেখে কেবলামুখ হয়ে অবস্থান করবে এবং সম্ভব না হলে কেবল কেবলামুখী হয়ে আরাফার সীমার ভিতরে যে কোন স্থানে অবস্থান করবে। জাবালে আরাফাতে চড়া বা তার উপর অবস্থান করা কোন বিধেয় কর্ম নয়। ঐ পর্বতে চড়লে কোন পৃথক মর্যাদা বা মাহাত্ম্যও নেই। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/২৬৩)*

এই স্থানে হাজীর উচিত যে, একাগ্রচিত্তে ও গভীর ভক্তি ও একনিষ্ঠ ভাবাবেগের সাথে তেলাঅত, যিক্র, দুআ ও ইস্তেগফার করবে। মহান আল্লাহর সমীপে অনুনয়- বিনয় করবে। নিজের শক্তিহীনতা ও মুখাপেক্ষিতা তাঁর নিকট প্রকাশ করবে। 'কিছু প্রয়োজন নেই' বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে না এবং নিতান্ত আগ্রহের সাথে তাঁর নিকট ক্ষমা, মুক্তি ও সাহায্য ভিক্ষা করবে। নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করবে।

এই মহান দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হচ্ছে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।'

এই দুআ বেশী বেশী করে পাঠ করবে। এ ছাড়া সহীহ হাদীসে

বর্ণিত অন্যান্য যিক্র, দুআ ও অযীফাহ এবং তালবিয়াহ পাঠ করবে। তালবিয়ার সাথে **'ইন্নামাল খাইরু খাইরুল আ-খিরাহ'** অতিরিক্ত করাও বৈধ। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৩০পৃঃ)*

এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ দিনে এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো অবশ্যই উচিত নয়, দুই হাত তুলে সকাতরে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও সুখ তাঁর নিকট প্রার্থনা করে নেবে। কোন রকমের সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত মনে নয়; বরং আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেনই- এই মন ও বিশ্বাস রেখে মিনতি সহকারে আকুল আবেদন পেশ করবে পরম দয়ালুর দরবারে। (যে বিষয়ে প্রার্থনা করবে সে বিষয়ে নববী দুআ অজানা থাকলে নিজের ভাষাতেই প্রার্থনা করবে। তবে নববী দুআই হল আফযল।) তাঁর অসীম করুণা ও বিরাট ক্ষমার আশা করবে। তাঁর ভয়ঙ্কর আযাব ও গযবকে ভয় করবে। নিজ আত্মার হিসাব নেবে এবং শুদ্ধচিত্তে তাঁর নিকট অনুশোচনার সাথে সকল পাপ কাজ থেকে তওবা করবে।

প্রকাশ যে, এই দিনে এই স্থানে হাজীদের জন্য (আরাফার) রোযা রাখা বিধেয় নয়।

এ এক মহাদিন, মহা সম্মেলন। এ দিনে মহান আল্লাহ বান্দাকে বহু কিছু দান করে থাকেন। এ দিনের জন-সমাবেশ নিয়ে তিনি ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন। জাহান্নাম হতে বহু মানুষকে মুক্তিদান করেন। এই দিনে শয়তান সর্বাধিক লাঞ্ছিত, অপদস্থ, হীনতাগ্রস্ত ও তুচ্ছ হয়; যেমন হয়েছিল বদর যুদ্ধের দিন।

এই ময়দানে হাজী সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। (এর পূর্বে আরাফাতের সীমানা হতে বের হওয়া বৈধ নয়।) সূর্য অস্ত গেলে ধীর ও শান্তভাবে মুযদালিফার প্রতি রওনা হবে। চলার পথে কোন মানুষকে কষ্ট দেবে না, ভিঁড়ে ধাক্কাধাক্কিও করবে না। বাজে কথা, কাজ ও তর্ক থেকে দূরে থাকবে। রাস্তা খালি পেলে শীঘ্র চলবে। বেশী বেশী তালবিয়াহ পাঠ করবে। মুযদালিফায় পৌঁছনর পর মাগরিব ও এশার নামায জমা ও কসর করে আদায় করবে। কিন্তু রাস্তার মধ্যে যদি এশার সময় হয়ে পার হবার আশঙ্কা থাকে, তবে যে কোন স্থানে পড়ে নেবে। এর মাঝে বা পরে কোন নফল পড়বে না। (বিতরের ব্যাপারে মতভেদ আছে।) নামায শেষে অন্য কোন কাজ, গল্প বা অযীফায় রাত্রি না জেগে সকাল সকাল ঘুমিয়ে বিশ্রাম নেবে। যাতে কুরবানীর দিন বিভিন্ন কর্তব্য আদায়ে ত্রুটি ও আলস্য না আসে। অতঃপর প্রথম সময়ে (আওয়াল ওয়াক্তে) ফজরের নামায আদায় করে মাশআরুল হারাম (পর্বতের) নিকট অবস্থান করে কেবলামুখ হয়ে আল্লাহর যিক্র করবে এবং হাত তুলে দুআ করবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

((فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ)) (١٩٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন তোমরা আরাফাত (প্রান্তর) হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশআরুল হারামের নিকটে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে

স্মরণ কর; যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। *(সূরা বাকারাহ ১৯৮ আয়াত)*

প্রকাশ থাকে যে, ঐ পর্বতের নিকটবর্তী হওয়া ওয়াজেব নয়। যেমন ওর উপরে চড়াও কোন বিধেয় কর্ম নয়।

উজ্জ্বল সকাল হয়ে এলে সূর্যোদয়ের পূর্বে সেখান হতে মিনার প্রতি যাত্রা করবে। এই সময় অধিক অধিক তালবিয়াহ পড়বে। ওয়াদি মুহাস্সির পৌঁছে একটু শীঘ্র চলবে।

বৃদ্ধ, নারী অথবা শিশু প্রভৃতি দুর্বল শ্রেণীর মানুষ ও তাদের সবল সঙ্গী ও অভিভাবকদের জন্য রাত্রে চন্দ্রাস্তের পর মিনা যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। *(বুখারী ১৫৯৪, মুসলিম ১২৯৩নং)*

১০ই যুলহজ্জ

মিনা পৌঁছে জামরাহ আক্বাবাহ (যাকে বড় জামরাহ বলা হয় এবং যা মসজিদে খাইফ থেকে তৃতীয় ও শেষ এবং মক্কা থেকে প্রথম পাথর মারার স্থান) পৌঁছে তালবিয়াহ বন্ধ করবে ও পাথর মারবে। তবে সবল ও সক্ষম ব্যক্তিরা সূর্যোদয়ের পরই পাথর মারবে।

সাতটি পাথর দ্বারা রম্ই জিমার করবে। পাথরগুলি সাইজে ছোলা থেকে একটু বৃহদাকার হবে। এই পাথর যে কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করা যাবে। মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করা জরুরী নয়। তবে মিনায় পৌঁছে পাথর না পাওয়ার বা সংগ্রহ করতে সময় না পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুযদালিফা থেকে কুড়িয়ে রাখবে। সংগ্রহের পর পাথরগুলিকে ধৌত করতেও হবে না। প্রতি নিক্ষেপের সাথে

তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে। এই স্থানে নির্দিষ্ট কোন পঠনীয় দুআ নেই।

এই সময় হাজীর উচিত, আল্লাহর জন্য তা'যীম ও বিনয় প্রকাশ করা। শক্তি ব্যবহার বা ধাক্কাধাক্কি করে অপর হাজীকে কষ্ট দিয়ে শান্তি ভঙ্গ না করা। পাথর মারার সময় নিশ্চিত হওয়া যে, তার পাথর ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে পড়ছে কি না? স্তম্ভে বা দেওয়ালে লেগে হওযের বাইরে যেন চলে না আসে।

প্রকাশ যে, ব্যবহৃত পাথর কুড়িয়ে দ্বিতীয় বার মারা যাবে না।

কা'বা শরীফকে বামে ও মিনাকে ডাইনে করে বাতনে ওয়াদীতে দন্ডায়মান হয়ে এই পাথর মারা মুস্তাহাব। ভিঁড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে অন্যান্য দিক হতে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরবানীর দিন সূর্য ওঠার পর থেকে সূর্য ঢলা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জামরাহ আকাবায় পাথর মারা সুন্নত। অবশ্য ঐ দিনে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মারলেও সিদ্ধ সময়ে মারা হয়। কিন্তু যদি কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে মারতে না পারে তাহলে (পরে আর পাথর না মেরে) পরদিন সূর্য ঢলার পর (কাযা) মেরে নেবে। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/২৭৫)*

পাথর মারার পর তামাত্তু বা ক্বিরান হজ্জ করলে কুরবানীগাহে এসে মিনার অন্যান্য জায়গা বা মক্কার যে কোন জায়গাতেও কুরবানী করতে পারে। যদি ঐ দিনে সম্ভব না হয়, তাহলে পরবর্তী ১৩ তারীখ পর্যন্ত যে কোন দিন করে নেবে। কুরবানী নিজ হাতে করা

অসুবিধা বুঝলে কুরবানী-বিষয়ক নির্দিষ্ট সংস্থা বা ব্যাংকে কুরবানীর মূল্য পূর্বেই জমা দেবে।

তারপর মাথা নেড়া বা চুল ছোট করবে, তবে নেড়া করাই উত্তম। কুরবানীর মূল্য জমা দিয়ে থাকলে পাথর মেরেই কেশ মুন্ডন অথবা কর্তন করতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুন্ডন অথবা কর্তন পুরো মস্তক হতেই হতে হবে। মহিলা প্রত্যেক বেণী হতে এক আঙ্গুলের অগ্র (এক গিঁড়ে) বরাবর কাটবে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য মাথার উপরে খোঁপা বা ঝুটি বাঁধা বৈধ নয়। মাথার পিছন দিকে খোঁপা বাঁধা থেকে বেণী বা চুটি গেঁথে মাথা বাঁধা ভালো এবং হজ্জ বা উমরার সময় ঐ এক গিঁড়ে পরিমাণ ছাড়া অন্য সময় চুল ছোট করা বা কাটিং করা বৈধ নয়। বৈধ নয় বেগানা পুরুষের সামনে চুলের ডগা কাটা।)

এতটুকু করার পর মুহরিমের জন্য প্রথম হালাল লাভ হয়। তাই এবারে সে নিজের সাধারণ পোশাক পরতে পারে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে, নখ কাটতে পারে ইত্যাদি। বরং স্ত্রী ব্যতীত সর্বপ্রকার বস্তু ও কর্ম যা এহরামে অবৈধ ছিল বৈধ হয়ে যায়। কুরবানী করতে না পারলেও পাথর মেরে কেশ মুন্ডন বা কর্তন করার পর, অথবা পাথর মেরে তওয়াফ ও সা'ঈ করার পর, অথবা তওয়াফ, সা'ঈ ও কেশ মুন্ডনের পর এই হালাল লাভ হয়। *(আত্তাহক্বীক্ব অলঈযাহ ৫৬পৃঃ)* মতান্তরে কেবল পাথর মারার পরই প্রথম হালাল লাভ হয়। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৩৩পৃঃ)*

মাথা নেড়া করার পর খোশবু ব্যবহার করে হাজী কা'বার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে হজ্জের তওয়াফ (তওয়াফে ইফাযাহ বা যিয়ারাহ) করবে; যা হজ্জের এক রুক্ন এবং যা না করলে হজ্জই হয় না।

যার প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যেন দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে।" *(কুঃ ২২/২৯)*

ঐ দিনে সম্ভব না হলে রাত্রে অথবা তশরীকের যে কোন দিনে ঐ তওয়াফ করতে পারে। অতঃপর তওয়াফের পর মাক্বামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে দুই রাকআত নামায আদায় করে সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ করবে। যদি তামাত্তু হজ্জ হয় তাহলে এটা তার হজ্জের সা'ঈ হবে এবং পূর্বেকার সা'ঈ ওমরার। ক্বিরান অথবা ইফরাদ হজ্জে তওয়াফে কুদূমের সাথে সা'ঈ না করে থাকলে সা'ঈ করবে।

এই তওয়াফ (ও সা'ঈর) পর মুহরিম সম্পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যাবে। তখন স্ত্রী-সঙ্গমও তার জন্য বৈধ হবে।

কুরবানীর দিন করণীয় আমলগুলিকে নবী ﷺ-এর মত যথাক্রমে করাটাই সুন্নত। অতএব সর্বপ্রথম পাথর মারবে, অতঃপর কুরবানী, অতঃপর মস্তক মুন্ডন বা কেশ কর্তন, তারপর তওয়াফ ও সা'ঈ। অবশ্য এর ব্যতিক্রম করলেও কোন দোষ নেই। তবে পাথর মারার কাজ সর্বাগ্রে করা উচিত। কারণ, তা মিনার এক অভিবাদন। *(মুগনী ৫/২৮৮)*

যমযমের পানি পান করা এবং তারপর কোন ফলপ্রসূ দুআ করা ও তা মাথায় ঢালা হাজীর জন্য মুস্তাহাব। যেহেতু যমযমের পানি এক প্রকার আহার ও মহৌষধ এবং তা যে উদ্দেশ্যে পান করা যায় আল্লাহ তা পূরণ করেন।

প্রকাশ যে, যমযমের পানি কেবলামুখ হয়ে পান করা এবং তারপর 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফেআ-----' দুআ পাঠ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি যয়ীফ। *(ইরওয়াউল গালীল ৪/৩২৫, ৩৩২-৩৩৩)* যেমন ঐ পানিতে (বিধেয় মনে করে) গোসল করা বিদআত। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৫৩পৃঃ)*

১১ ও ১২ই তারীখ

এরপর হাজী মক্কা থেকে পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন করবে এবং এগারো ও বারো তারীখের (অধিকাংশ) রাত্রি যাপন করবে। যা হজ্জের এক নিদর্শন বিশেষ, আর তা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। কারণ, রসূল করীম ﷺ পানি পরিবেশক ও পশুরক্ষক দলকে মিনায় রাত্রি যাপন না করতে অনুমতি দিয়েছেন। এই 'অনুমতি' শব্দটি ইঙ্গিত বহন করে যে, তার বিপরীত (রাত্রি যাপন করাটা) অবশ্য-কর্তব্য। অনুরূপভাবে যাদের অন্যান্য কোন ওযর ও অসুবিধা থাকবে তাদের জন্যও মিনা ছাড়া যথাস্থানে রাত্রি যাপনে অনুমতি হবে।

এই দুই দিনে তিন জামরাতেই পাথর মারাও ওয়াজেব। এর সময় শুরু হয় সূর্য ঢলার পর থেকে।

পাথর মারার জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়াটাই আফযল। *(সিলসিলাহ*

সহীহাহ ৫/১০৩) প্রথম জামরাহ (যা মসজিদে খাইফ থেকে নিকটতম ও মক্কা থেকে তৃতীয় বা দূরতম)তে পরস্পর সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রতি নিক্ষেপের সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। অতঃপর একটু সরে গিয়ে জামরাকে বামে করে কেবলামুখ হয়ে দুই হাত তুলে বেশী বেশী করে অনুনয়-বিনয় সহকারে দুআ করা সুন্নত।

অতঃপর মধ্যম জামরায় অনুরূপভাবে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর একটু অগ্রসর হয়ে এই জামরাকে ডাইনে করে পূর্বের ন্যায় কিবলামুখে দুআ করা সুন্নত। অবশেষে তৃতীয় বা শেষ (আক্বাবাহ) জামরায় অনুরূপ সাতটি পাথর মারবে। আর এর নিকট (দুআর জন্য) না দাঁড়িয়ে যথাস্থানে প্রস্থান করবে।

দ্বিতীয় দিনে (১২ তারীখে)ও অনুরূপ করবে। এরপর তাড়াতাড়ি থাকলে পাথর মারার পর পরই সফর করতে পারে; এবং তাতে কোন দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) (٢٠٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর, আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনেই চলে আসে তাতে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। এ (নিয়ম) তার জন্য যে ধর্মভীরু। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে একত্র করা হবে। *(সূরা*

বাকারাহ ২০৩ আয়াত)

তবে সূর্যাস্তের আগে আগেই তাকে মিনা ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য মিনা ত্যাগকালে রোড জ্যাম বা অন্যান্য কারণে মিনার মাঝে পথেই সূর্যাস্ত হলে মিনায় থাকা অবধারিত হবে না। কারণ, পূর্বেই সে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিয়ে চলতে শুরু করেছে। নচেৎ সূর্য ডুবে গেলে ঐ রাত্রি যাপন করে পরের দিন (১৩ই যুল হজ্জ) সূর্য ঢলার পর পূর্বের ন্যায় পাথর নিক্ষেপ করে দেশে (বা মক্কায়) ফিরে যাবে। আর এটাই সুন্নত, আফযল ও সওয়াবের দিক দিয়েও বড়। ঐ দিনে পাথর মারলে তা কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর (জ্যোতি) হবে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫১৫নং)*

কিন্তু ১২ তারীখের দুপুরের পূর্বে পাথর নিক্ষেপের জন্য কাউকে প্রতিনিধি করে দিয়ে সফর করা বৈধ নয়, যেমন সূর্য ঢলার পূর্বে পাথর মেরে থাকলে তা যথেষ্ট নয়। এতে ফিদ্‌য়্যাহ লাগবে।

কোন ওযরের ক্ষেত্রে ১১ তারীখের বা ১১ ও ১২ তারীখের রম্‌ইকে ১৩ তারীখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া চলে। কারণ তাশরীকের দিনগুলির প্রত্যেকটাই রম্‌ইর সময়। অতএব (সামর্থ্য থাকতে) প্রতিনিধি করার চেয়ে এরূপ করাটাই উত্তম। যেহেতু রসূল ﷺ উট রক্ষকদলকে কুরবানীর দিন রম্‌ই করে তার পরবর্তী দুই রম্‌ইকে একত্রিত করে দু'দিনের মধ্যে কোন এক দিনে রম্‌ই করার অনুমতি দিয়েছিলেন। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলাবানী ৪০পৃঃ)*

অতএব এই পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি করা জায়েয থাকলে নিশ্চয়

তিনি ﷺ তাদেরকে তার নির্দেশ দিতেন। কারণ, তা সহজ ছিল।

পক্ষান্তরে যারা রম্‌ই করতেই অক্ষম; যেমন, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী প্রভৃতি) তাদের জন্য অপরকে উকিল করা বৈধ। এক্ষেত্রে উকিল প্রত্যেক জামরায় প্রথমে নিজের তরফ থেকে সাতটি অতঃপর মোয়াক্কেলের তরফ থেকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। কিন্তু উকিলকে বর্তমান হজ্জের হাজী অবশ্যই হতে হবে।

সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই রম্‌ই করে নেওয়া উত্তম। অবশ্য কিছু আহলে ইল্‌ম তার পরে করাও বৈধ বলেছেন। আর তাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, রসূল ﷺ রম্‌ই শুরু হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করেছেন; কিন্তু শেষ হওয়ার সময় নির্ধারিত করেন নি।

উপরন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, 'একজন নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি সন্ধ্যাবেলায় পাথর মেরেছি?' তিনি বললেন, "মারো, কোন ক্ষতি নেই।" *(বুখারী ১৬৪৮নং)*

আর আরবীতে মাসা- (সন্ধ্যাবেলা) বলে সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্তের পরেও রাত্রি পর্যন্ত সময়কে। কিন্তু নবী ﷺ জিজ্ঞাসাকারীর নিকট এ বিষয়ে কোন বিবরণও জানতে চাননি যে, সে সূর্যাস্তের পূর্বে অথবা পরে রম্‌ই করেছে। যাতে সাধারণভাবে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, রাত্রেও রম্‌ই করা বৈধ। ইমাম নওবী 'শরহে মুহায্‌যাব'এ বলেন, 'রাত্রে রম্‌ই করার ব্যাপারে দু'টি মত আছে। সঠিক মত বৈধতার। কারণ, উট রক্ষকদেরকে রাত্রিকালে রম্‌ই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।'

পক্ষান্তরে এই অভিমতই ইসলামের সরলতা ও অনায়াস-সিদ্ধতার অনুকূল। বিশেষ করে এই যুগে হাজীদের ক্রমশঃ সংখ্যাধিক্যে যে কষ্ট ও অসুবিধা হয় এবং অতি ভিঁড়ের চাপে যে কিছু মানুষ আহত এবং নিহতও হয়, তা বলাই বাহুল্য। আর সূর্য ঢলার পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় এই বিরাট সংখ্যক হাজীদের রম্‌ই করার জন্য যথেষ্ট নয়। অবশ্য ভিঁড় হওয়াই এই অভিমতের সঠিকতার কারণ নয়। কারণ, হাজীদের জন্য ওয়াজেব, ইসলামী আদবের অনুগমন করা এবং আত্মরক্ষার সাথে সাথে অপর হাজীদের জানেরও হিফাযত করা। যা পালন করলে অবশ্যই ভিঁড়ের চাপে প্রাণহানি ঘটে না। কিন্তু পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতেই ওযরওয়ালা অক্ষমদের জন্য রাত্রে রম্‌ই করার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। অতএব পশুরক্ষক, পানি পরিবেশক, বৃদ্ধ, দুর্বল, শিশু ও মহিলাদের জন্য রাত্রে পাথর নিক্ষেপ বৈধ ও সিদ্ধ হবে। কারণ, সাধারণতঃ তখন ভিঁড় থাকে না। *(আলমাজমূ' ৮/২৪০, আযওয়াউল বায়ান ৫/২৮৩, সিফাতুল হাজ্জ, ইবনে উসাইমীন ৬২পৃঃ)*

হাজীর স্মরণে রাখা উচিত যে, রম্‌ই জিমার এক ইবাদত যা রসূল ﷺ-এর অনুকরণ করে আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যার জন্য প্রত্যেকেই প্রতি নিক্ষেপে 'আল্লাহু আকবার' বলে থাকে। নবী ﷺ বলেন, "পাথর নিক্ষেপ ও সাফা মারওয়ার সা'ঈর বিধান আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠার জন্যই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ)*

অতএব এই পবিত্র স্থানসমূহে যিক্র থেকে বিস্মৃতি ও গাফলতি আদৌ উচিত নয়। বরং তকবীর ও দুআর একান্ত খেয়াল রাখা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا }

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তোমরা (হজ্জের) যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন (মিনায়) আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন (জাহেলী যুগে) তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে (গর্বের সাথে, কিংবা শিশু অবস্থায় মা-বাবাকে) স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২০০ আয়াত)*

যেমন এই সকল স্থানে অপরকে ক্লেশদান, আপোসে বাজে কথাবার্তা, মহিলাদের প্রতি অবৈধ দৃষ্টিপাত ইত্যাদিও অধিকরূপে বৈধ নয়। *(সূরা বাকারাহ ২০০ আয়াত)*

পাথর নিক্ষেপের সময় মাথায় ও কোমরে কাপড় বেঁধে জামার আস্তীন গুটিয়ে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখিয়ে লোকের ভিঁড় চিরা উচিত নয়। তদনুরূপ পাথর মারার সময় এ বিশ্বাস ও ধারণা রাখা উচিত নয় যে, তা শয়তানকে মারছে। *(আলমিনহাজ ফী ইয়াওমিয়্যাতিল হাজ্জ ২৫পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৩৬)* যেমন, সাফা-মারওয়া সা'ঈ করা কালীন এ ধারণা রাখা উচিত নয় যে, সে পানি খুঁজছে অথবা কোন লোক খুঁজছে। বরং কর্মের হেতু ছাড়া এ সবের মূলে রয়েছে আল্লাহর যিক্র ও নবী ﷺ এর অনুকরণ। অনুরূপভাবে অতিরঞ্জন করে বড় পাথর, ছাতা, জুতা ইত্যাদি নিক্ষেপ বৈধ নয়।

মক্কা মুকার্রামার আদব ও বিদায়ী তওয়াফ

এ নিরাপদ নগরীতে অবস্থানকালে হাজীকে (মুসলিমকে) বিশেষরূপে সতর্কতা, সাবধানতা ও সংযমশীলতা অবলম্বন করা উচিত। যাতে তার দ্বারা কোন প্রকারের পাপ সংঘটিত না হয়ে যায়। যেহেতু এই পবিত্র হারামে সংঘটিত পাপের শাস্তি বৃহত্তর। আল্লাহ পাক বলেন,

(وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ)

অর্থাৎ, যে তাতে (মসজিদে হারামে) সীমালংঘন করে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে তাকে আমি মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।" *(কুঃ ২২/২৫)*

অতএব সেখানে পাপের ইচ্ছা করলে যদি মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হয়, তাহলে পাপ-ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করলে কি শাস্তি হবে -তা অনুমেয়। আবার সেখানে কুফ্র ও শির্ক করলে তার ভোগ্য শাস্তির কথা বলাই বাহুল্য।

যেমন হাজীর উচিত, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে হারামে আদায় করা। কারণ, এখানে ১টি নামায ১ লক্ষ নামায অপেক্ষা উত্তম। যেমন তার উচিত, বেশী বেশী তওয়াফ করা। তবে

হজ্জ-উমরাহ ছাড়া কেবল সা'ঈ করা বিধিসম্মত নয়।

পারতপক্ষে কোন নামাযীর সামনে দিকে অতিক্রম বৈধ নয়। যেহেতু সব মসজিদেই সুতরা জরুরী। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৭পৃঃ)*

মক্কায় অবস্থানকালে হাতে সময় দেখে তানঈম (মসজিদে আয়েশা) বা জিঈর্রানাহ ইত্যাদির মীকাতে বের হয়ে বার বার উমরাহ করার ভিত্তি সুন্নায় নেই।

হজ্জের সমস্ত কাজ শেষ করে যখন হাজী নিজের বাড়ি ফিরতে চাইবে তখন তার উপর তওয়াফে বিদা' (বিদায়ী তওয়াফ) ওয়াজেব হবে। যে ব্যক্তি তওয়াফে ইফায়াহ বাকী রেখে মিনা থেকে সফরের নিয়তে মক্কা শরীফ যাত্রা করবে এবং তওয়াফে ইফায়াহ করেই দেশে ফিরতে চাইবে, তার জন্য ঐ একটা তওয়াফই যথেষ্ট হবে। আর ভিন্নভাবে তওয়াফে বিদা' করতে হবে না। ছোট বড়র মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। অতএব নিয়ত থাকবে তওয়াফে ইফায়ার। কারণ, তা রুক্ন। এটা সিদ্ধ হবে এই জন্য যে, আদেশ হচ্ছে, হাজীর সর্বশেষ বিদায়-স্থল হবে কা'বাগৃহ, আর তওয়াফে ইফায়ার পরই সফর করলে তার ঐ আদেশ পালন হয়ে যায়। তাছাড়া যেহেতু একই প্রকারের দু'টি ইবাদত একই সময়ে উপস্থিত হয়, তাই একটি অপর থেকে যথেষ্ট করবে।

(পূর্বে তওয়াফে ইফায়াহ করে থাকলে) ঋতুমতী মহিলাদের ক্ষেত্রে তওয়াফে বিদা' ওয়াজেব নয়। সফরের সময় পবিত্রা হলে তওয়াফ করবে নচেৎ সঙ্গীদের সাথে সফর করবে।

এই বিদায় কালীন তওয়াফের পর আর কোন কাজের খাতিরে মক্কা শরীফে অবস্থান করা উচিত নয়। বরং সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা থেকে বিদায় হবে। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করে '**আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ অসাল্লিম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফায্বলিক**' দুআ পাঠ করবে। বের হবার সময় কা'বার দিকে সম্মুখ করে উল্টা পায়ে বের হবে না। চলার সময় পিছন ফিরে কা'বার দিকে তাকাতে তাকাতে, অথবা চলতে চলতে থেমে কা'বার প্রতি বিয়োগব্যথা প্রকাশ করা শরীয়ত-সম্মত নয়। *(মানসাক, ইবনে তাইমিয়্যাহ ৩৮৭পৃঃ)*

দেশে ফিরার সময় সঙ্গে যমযমের পানি বহন করে নিয়ে গিয়ে রোগীদের পান করানো, মাথায় ঢালা এবং বর্কত ও আরোগ্যের আশা রাখা বিধিসম্মত। *(তিরমিযী ৯৬৩নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৮৩নং)*

মসজিদে নববীর যিয়ারত

হজ্জের পূর্বে অথবা পরে যে কোন সময়ে মদীনা শরীফের মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নত। যেহেতু ঐ মসজিদের বড় মাহাত্ম্য ও ফযীলত রয়েছে। এখানে এক ওয়াক্ত নামায পড়লে এক হাজার ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামাযের সওয়াব লাভ হয়। যেমন, কা'বার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়লে এক লক্ষ ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামাযের সওয়াব লাভ হয়।

মদীনার মসজিদ যিয়ারতের জন্য ইহরাম পরা বিধিসম্মত নয়।

যেমন সফরকালে নবীজীর কবর যিয়ারতের নিয়ত করা বৈধ নয়।

যিয়ারতকারী যখন মসজিদে পৌঁছবে তখন তার ডান পা আগে বাড়িয়ে *'বিসমিল্লাহি অস্‌সালাতু অসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আউযু বিল্লাহিল আযীম, অবিঅজহিহিল কারীম, অসুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।* অথবা *'আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিক'* এই দুআ বলে প্রবেশ করবে। যেমন, অন্যান্য সকল মসজিদ প্রবেশের সময় এই দুআই পড়া হয়। কারণ, মসজিদে নববী প্রবেশের সময় কোন নির্দিষ্ট দুআ বা যিক্‌র নেই।

অতঃপর 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' দুই রাক্‌আত নামায আদায় করবে এবং তাতে পছন্দমত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও শান্তি প্রার্থনা করবে। এই নামায রওযায় পড়লে আরো উত্তম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার গৃহ ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের রওযাহ (বাগিচা) সমূহের এক রওযাহ (বাগিচা)।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৫৫৮৬, ৫৫৮৭নং)*

উল্লেখ্য যে, তাঁর গৃহ এখন তাঁর সমাধিক্ষেত্র। যার উপর সবুজ গম্বুজ নির্মিত আছে। যা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হুজরা ছিল। এ সমাধিক্ষেত্রকে রওযাহ বলা হয় না। বরং এই হুজরার পশ্চিম পার্শ্বে নববী মিম্বর পর্যন্ত স্থানকে রওযাহ বলা হয়।

অতঃপর নামায আদায়ের পর নবী ﷺ এবং তাঁর দুই সাথী আবূবকর ؓ ও উমার ؓ এর কবর যিয়ারত করবে। মসজিদের ভিতর (পশ্চিম) থেকে পূর্ব গেটে বের হতে বাম দিকে সর্বপ্রথম কবরে নববী পড়ে। যার

ঠিক সোজাসোজি করে রেলিং এর দেওয়ালে একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র বা গোলাকার ফাঁক আছে। ঐ ফাঁকের সম্মুখে আদব ও শ্রদ্ধার সাথে (কোন রকমভাবে না ঝুঁকে বা তাহরিমার মত হাত না বেঁধে দন্ডায়মান হবে। অতঃপর তাঁর উপর সালাম পাঠ করবে; বলবে, *'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।'* তিনি এই সালামের উত্তর দিয়ে থাকেন। অবশ্য তা ইহজগৎ থেকে কেউই শুনতে ও অনুভব করতে পারে না।

অতঃপর তাঁর উপর দরূদ পাঠ করবে এবং তাঁর জন্য দুআ করবে। তারপর একটু পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পরবর্তী ছিদ্রের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর ؓ এর উপর সালাম পড়বে। তাঁদের জন্য দুআ করবে এবং আল্লাহর নিকট তাঁর সন্তোষ প্রার্থনা করে বলবে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।' হুজরার নিকট বেশী লম্বা সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে না এবং শোরগোল করবে না ও জোরে কথাবার্তাও বলবে না; বরং প্রয়োজনে নিম্নস্বরে কথা বলবে।

কোন কবরের নিকট কবরবাসীর কাছে নিজের জন্য কিছু চাইবে না; কারণ, তা শির্ক। কিছু চাইতে হলে আল্লাহরই নিকট চাইবে। অনেকে বলেন, কেবলামুখী হয়ে দুআ করবে। আল্লাহর রসূলের শাফাআতও তাঁর নিকট নয়, বরং তা আল্লাহরই নিকট চাইবে।

হুজরার তওয়াফ করা, স্পর্শ করে গায়ে মাখা বা চুম্বন করা, মিহরাব বা মিম্বর স্পর্শ করা বা চুম্বন করার অনুমতি ইসলামে নেই। মিহরাবে নববীতে নামায পড়ারও কোন কথা বা ফযীলত শরীয়তে

নেই। মসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়াও শরীয়ত-সম্মত নয়।

প্রকাশ থাকে যে, কবর যিয়ারত কেবল পুরুষরাই করতে পারে মহিলারা দূরে থেকেই বা যে কোন স্থান থেকেই সালাম ও দরূদ পাঠ করবে। অবশ্য মসজিদে নামায পড়লে পুরুষের সমান সওয়াবের অধিকারিণী হবে।

মদীনার যিয়ারতকালে সম্ভব হলে পাঁচ ওয়াক্তেরই নামায মসজিদে নববীতে আদায় করবে। (চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়তে হয় কথাটি ভিত্তিহীন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসটি মুনকার।) *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১/ ৫৪০)* যিক্র দুআ ও নফল নামায বেশী বেশী করে পড়বে। সম্ভব হলে রওযাতে নফল নামায অধিক পড়বে। তবে ফরয নামাযের সময় রওযাহ ছেড়ে প্রথম কাতারে ও ডাইনে শামিল হবে। যেহেতু প্রথম কাতারে ও ডাইনে নামায পড়ার ফযীলত আরো বেশী।

স্মরণে রাখার বিষয় যে, কবরে নববীর যিয়ারত ওয়াজেব নয়। হজ্জের কোন অঙ্গ বা শর্তও নয়। বরং তা নিকটবর্তী মানুষ ও মসজিদে নববীর যিয়ারতকারীর জন্য মুস্তাহাব। পরন্তু কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা দূরবর্তীদের জন্য বৈধ নয়। তবে পবিত্র মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নত। অতঃপর মসজিদে পৌঁছে গেলে কবরে নববী ও দুই সাহাবীর কবর যিয়ারত মুস্তাহাব। সুতরাং মক্কা বা কোন দূরবর্তী স্থান থেকে মদীনার পথে যাত্রাকালে হাজীর নিয়ত যেন কবর যিয়ারত না হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কবরকে ঈদ বানাতে নিষেধ করেছেন। তাঁর

কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে যে সব হাদীস বর্ণিত ও লোক মাঝে প্রসিদ্ধ আছে তার সবটাই জাল অথবা দুর্বল। যেমন, "যে ব্যক্তি হজ্জ করে অথচ আমার যিয়ারত করে না, সে আমার প্রতি অন্যায় করে।" "যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমার যিয়ারত করল।" "যে আমার যিয়ারত করে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজেব হয়ে যায়।" ইত্যাদি।

মদীনার যিয়ারতকারীর জন্য মুস্তাহাব মসজিদে কুবার যিয়ারত করা ও তাতে নামায পড়া। রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মসজিদের যিয়ারত করতেন এবং তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি বাড়িতে (বাসায়) পবিত্র হয়ে (ওযু করে) কুবার মসজিদে আসে এবং তাতে কোন নামায পড়ে, তাহলে তার একটি উমরাহ করা বরাবর সওয়াব লাভ হয়।" *(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)* উক্ত দুই মসজিদ ছাড়া আর অন্য কোন মসজিদ যিয়ারত সুন্নত নয়।

অবশ্য বাকী'র কবরসমূহ, শহীদগণের কবরসমূহ যিয়ারত করা সুন্নত। এই সব স্থানে কবর যিয়ারতের যথারীতি দুআ পাঠ করবে। (কোন বাঁধাগড়া দুআ পাঠ করবে না এবং কোন মুত্বাওবিফ বা পেশাদার গাইডের খপ্পরে পড়বে না।) আখেরাত স্মরণ করবে, কবরবাসীদের জন্য, তাঁদের আত্মার কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা, করুণা ও আশিস্ প্রার্থনা করবে।

এ ছাড়া তাঁদের কবরের নিকট দুআ কবুল হবে মনে করে দুআ করা, কোন কবরের খাদিম হওয়া, কবরবাসীর নিকট প্রয়োজন ভিক্ষা করা,

রোগমুক্তি বা কোন উন্নতি চাওয়া, তাঁদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অসীলায় আল্লাহর নিকট দুআ করা, মক্কা বা মদীনার কোন স্থানের মাটি বর্কতের আশায় সঙ্গে নেওয়া ইত্যাদি বিদআত ও শির্ক; যা শরীয়তে অবৈধ এবং সলফে সালেহীনগণও তা কোন দিন করে যান নি বা করার নির্দেশও দেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু হাজী পাপক্ষয় করতে এসে শির্ক ইত্যাদির বড় পাপের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরে, ফরয আদায় করতে এসে মুশরিক হয়ে দেশে ফিরে। অনেকের ভাগ্যে কেবল কষ্ট, আড়ম্বর, আনুষ্ঠানিকতা অর্থব্যয় ও সুনামই থাকে। অনেকে হারাম উপায়ে অর্থোপার্জন করে (সূদ, ঘুষ ইত্যাদির টাকা নিয়ে) হজ্জ করে আসে। বলা বাহুল্য, এমন মানুষদের জীবনে হজ্জ কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। বরং পাপ ও পঙ্কিলতার জীবন পথে তার অবস্থা 'যথা পূর্বং তথা পরং' থাকে, তাহলে মনে প্রশ্ন থাকে যে, এমন লোকদের হজ্জ কবুল হয় কি? আল্লাহই জানেন।

পক্ষান্তরে যে তওহীদবাদীরা হালাল মাল দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যে, তাঁর রসূল ﷺ-এর তরীকা বা পদ্ধতিমতে কোন প্রকারের গর্হিত ও অবিধেয় কাজে লিপ্ত না হয়ে হজ্জ পালন করে, তাদের জন্য আশা করা যায়, ইনশাল্লাহ- তিনি তাদের 'লাব্বাইক' (হাজির হাজির ডাকে) সারা দেবেন এবং তাদের হজ্জ কবুল করবেন। তারাই নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরবে এবং তাদের আগামী জীবন সেই আলোকে আলোকিত, সংশোধিত ও পরিবর্তিত হবে। আর পরকালে লাভ করবে জান্নাতের মহাপুরস্কার।

আরাফার দিনের ফযীলত ও কর্তব্য

যুলহজ্জের ফযীলতপূর্ণ দশ দিনের মধ্যে আরাফার দিন অন্যতম। এই দিন পাপক্ষয়ের দিন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন। গৃহে অবস্থানকারী মুসলিমদের জন্য রোযা মুস্তাহাব হওয়ার দিন। যে দিনে দ্বীনে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ মুসলমানদের উপর সম্পন্ন হয়েছে। হযরত উমার বিন খাত্তাব ﵁ হতে বর্ণিত, তাঁকে ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আমিরুল মুমেনীন! আপনাদের কিতাবের এক আয়াত যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, ঐ আয়াত যদি ইয়াহুদী সম্প্রদায় আমাদের উপর অবতীর্ণ হত, তাহলে (যে দিনে অবতীর্ণ হয়েছে) ঐ দিনটাকে আমরা ঈদ বলে গণ্য করতাম।' তিনি বললেন, 'কোন্ আয়াত?' বলল, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম" (এই আয়াত)। হযরত উমার ﵁ বললেন, 'ঐ দিনটিকে আমরা জেনেছি এবং সেই স্থানটিকেও চিনেছি; যে স্থানে ঐ আয়াত নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি জুমআর দিন আরাফার ময়দানে দন্ডায়মান ছিলেন। *(বুখারী ৪৫,*

মুসলিম ৩০১৭নং)

প্রশ্নকারী ছিল কা'ব আল আহবার। যেমন তফসীরে ত্বাবারী (৯/৫২৬) তে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ঐ আয়াত জুমআর দিন এবং আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ দু'টি দিনই আমাদের জন্য ঈদ, আলহামদু লিল্লাহ। [৪]

আরাফার দিনের গুরুত্ব সম্বন্ধে নবী ﷺ বলেন, "আরাফার দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই যেদিন আল্লাহ অধিকরূপে বান্দাদেরকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করেন ও বলেন, 'কি চায় ওরা?' *(মুসলিম ১৩৪৮নং)*

ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, 'হাদীসটি নির্দেশ করে যে, আরাফায় অবস্থানকারীগণ মার্জিত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত। কারণ, আল্লাহ পাক তওবা ও ক্ষমার পর ছাড়া পাপীদেরকে নিয়ে গর্ব করেন না। অল্লাহু আ'লাম।' *(তামহীদ ১/১২০)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "আরাফার দিন ছাড়া অন্য কোন দিনে শয়তানকে অধিক অপদস্থ, লাঞ্ছিত, হীনতাগ্রস্ত ও ক্রুদ্ধ হতে দেখা যায়নি। যেহেতু সে সেদিন আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হতে এবং মানুষের বড় বড় পাপ মার্জনা হতে দেখে তাই। যেমন বদরের যুদ্ধের দিনও সে অপদস্থ হয়েছিল। যখন জিবরীল ﷺ-কে (যুদ্ধের জন্য) ফিরিশ্তাদলের ব্যূহবিন্যাস করতে দেখেছিল।" *(মুঅত্তা মালেক ১/*

(৪) *অনেকের ধারণা মতে জুমআর দিন আরাফার (হজ্জের) দিন হলে সেই হজ্জ আকবরী হজ্জ হয়-এ কথাটি ভিত্তিহীন।*

৪২২, হাদীসটি মুরসাল যয়ীফ, মিশকাত ২/৭৯৮)

ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, 'ঐ পবিত্র ময়দানে উপস্থিতির ফযীলতের পক্ষে এই হাদীসটি উত্তম। এতে মুসলিমদেরকে হজ্জ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এই হাদীসের অর্থ একাধিকভাবে সংরক্ষিত এবং এই হাদীস এই কথার উপর দলীল যে, যে ব্যক্তি এই মহাপ্রান্তরে উপস্থিত হবে তাকে আল্লাহ পাক মার্জনা করবেন। ইনশাআল্লাহ।'

নবী ﷺ আরো বলেন, "আল্লাহ তাআলা আরাফার দিন বিকালে আরাফাত-ওয়ালাদের নিয়ে আসমানবাসী ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমার বান্দাদেরকে দেখ, আমার নিকট ধূলিমলিন ও আলুথালু রুক্ষ কেশে উপস্থিত হয়েছে!" *(মুসনাদ আহমাদ ২/৩০৫, ইবনে খুযাইমা ৪/২৬৩)*

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ আরাফার দিনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণনা করে। এটি এমন দিন যাতে দুআ কবুল করা হয়, আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং পাপ মার্জনা করা হয়। তাইতো মুসলিমের উচিত, বিশেষ করে এই মহান দিনে নেক আমল করতে যত্নবান ও প্রয়াসী হওয়া; দুআ, যিক্র, তকবীর, তেলাঅত, নামায, সদকাহ প্রভৃতির মাধ্যমে এই দিনের যথার্থ হক আদায় করা। সম্ভবতঃ কোন বাহানায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাঁর দোযখের ভীষণ শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। ইবনে রজব বলেন, 'এই পুরস্কার সাধারণ সকল মুসলমানদের জন্য।' *(লাত্বায়িফুল*

মাআরিফ ৩১৫পৃঃ)

যদি কেউ যুলহজ্জের প্রথম তারীখ থেকে রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে তাকে এ মাসের ৯ম তারীখে রোযা রাখতে অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু রসূল ﷺ তার গুরুত্ব ও ফযীলতের উপর উম্মতকে বিশেষভাবে অবহিত করে রোযা রাখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আরাফার দিন রোযা অতীত এক বছর ও আগামী এক বছরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।" *(মুসলিম ১৬৬২নং)*

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রোযা আরাফাতে অবস্থানরত হাজীগণ রাখবেন না। কারণ ঐ দিন খেয়ে-পান করে শক্তি ও দৃঢ়তার সাথে বেশী-বেশী দুআ-যিক্র করার দিন এবং হাজীদের জন্য ঐ মহা-সমাবেশের দিন এক ঈদের দিন। তাই নবী ﷺ ঐ দিনে আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং নিজেও আরাফাতে রোযা রাখেন নি। *(বুখারী ১৫৭৫, মুসলিম ১১২৩নং, বায়হাকী ৫/১১৭, মুসনাদ আহমাদ ২/৩০৪, হাকেম ১/৪৩৪, আবূ দাউদ ২৪১৯নং)*

পূর্বে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অহাজীদেরকে পাঁচ ওয়াক্তের জামাআতী নামাযের পর বিশেষভাবে তকবীর পাঠ করতে হয় এবং তা ৯ই যুলহজ্জের ফজর থেকে শুরু হয়ে ১৩ই যুলহজ্জের আসরে সমাপ্ত হয়। ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, 'এ সম্বন্ধে নবী ﷺ কর্তৃক কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। শুদ্ধভাবে যা প্রমাণিত তা হচ্ছে আলী ﷺ, ইবনে মাসউদ ﷺ প্রভৃতি সাহাবাগণের উক্তি।' *(ফাতহুল বারী ২/৪৬২)*

ইবনে কুদামাহ বলেন, 'ইমাম আহমাদ (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ হাদীসের ভিত্তিতে মনে করেন যে, আরাফার দিন ফজরের নামাযের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ই যুলহজ্জ) পর্যন্ত তকবীর পাঠ করতে হয়?' তিনি বললেন, 'হযরত উমার, আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ ﷺ (সাহাবাগণের) সর্বসম্মতিক্রমে।' *(মুগনী ৩/২৮৯, ইরওয়াউল গালীল ৩/ ১২৫)*

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) এই তকবীর পাঠকে সঠিক বলে সমর্থন করেন এবং বলেন, 'অধিকাংশ সলফ, ফুকাহায়ে সাহাবা এবং ইমামগণেরও উক্তি এটাই।' *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/২২০,২২২)*

ইবনে কাষীর (রঃ) বলেন, 'এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি এবং এর উপরেই (সকলের) আমল।' *(তফসীর ইবনে কাষীর ১/৩৫৮)*

নামাযের পর যদি কেউ ঐ তকবীর একবার মাত্র পাঠ করে তাহলেই যথেষ্ট। অবশ্য তিনবার পড়াই উত্তম।

সুতরাং মুসলিমগণ ঈদের দিন ও তাশরীকের দিনগুলিতে তকবীর পাঠের উপর সানুরাগ মনোযোগ দেবে। মহিলারা বাড়িতে নামাযের পর অথবা মসজিদে জামাআতে উপস্থিত হলে জামাআতের পর চুপে চুপে তকবীর পাঠ করবে। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, 'মায়মূনাহ (রাঃ) কুরবানীর ঈদের দিন তকবীর পড়তেন এবং মহিলারা আবান বিন উষমান ও উমার বিন আব্দুল আযীযের পশ্চাতে তাশরীকের রাত্রিসমূহে পুরুষদের সাথে মসজিদে তকবীর পাঠ করত।'

দলীলের সহজার্থে এই কথাই প্রকাশ পায় যে, গৃহবাসী ও পথচারী, জামাআতে ও একাকী, আদায় ও কাযা, ফরয ও নফল নামাযের পরে পাঠ করতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে উলামাগণের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। তবে হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, 'ইমাম বুখারীর বাহ্যিক এখতিয়ারে বুঝা যায় যে, (তকবীর উপরোক্ত) সকল মানুষ ও নামাযেই শামিল হবে এবং তিনি যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করেছেন তা ঐ কথার সমর্থন করে।' *(ফাতহুল বারী ২/৪৫৭)*

অনুরূপভাবে মসবুক (যে ইমামের পিছে কিছু রাকআত পায়নি সে)ও বাকী নামায আদায় করে তকবীর পাঠ করবে। যেহেতু তকবীর সালাম ফেরার পর এক বিধেয় যিক্র। অল্লাহু আ'লাম।

কুরবানীর দিনের ফযীলত

কুরবানীর দিন এক মহান দিন। এই দিনকে 'হজ্জে আকবার' এর দিন বলা হয়। *(আবূ দাউদ ৫/৪২০, ইবনে মাজাহ ২/১০১৬)*

এই দিন সারা বছরের শ্রেষ্ঠতম দিন। নবী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর নিকট মহানতম দিন কুরবানীর দিন। অতঃপর স্থিরতার (কুরবানীর পরের) দিন। *(আবূ দাউদ ৫/ ১৭৪, মিশকাত ২/৮১০)*

কুরবানীর ঈদ বা ঈদুল আযহা, রোযার ঈদ বা ঈদুল ফিতর অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ঈদুল আযহাতে নামায ও কুরবানী আছে। কিন্তু ঈদুল ফিতরে আছে নামায ও সদকাহ। আর কুরবানী সদকাহ অপেক্ষা উত্তম। আবার কুরবানীর দিনে হাজীদের জন্য স্থান ও

কালের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা একত্রিত হয়। যেহেতু ঐ সময় পবিত্র কাবাগৃহের হজ্জ হয়। আর যার পূর্বে আরাফার দিন ও পরে তাশরীকের তিন দিন। আর এই দিনগুলির প্রত্যেকটাই হাজীদের জন্য ঈদ। *(লাতায়েফুল মাআরিফ ৩১৮পৃঃ)*

তাশরীকের দিনসমূহের ফযীলত

১১, ১২, ১৩ই যুলহজ্জকে 'আইয়্যামে তাশরীক' বলা হয়। তাশরীকের অর্থ হল, রৌদ্রে গোশ্ত শুকানো। যেহেতু এই দিনগুলিতে কুরবানীর গোশ্ত বেশী দিন রাখার জন্য রৌদ্রে শুকানো হত, তাই উক্ত দিনগুলির এই নামকরণ হয়।

এ দিনগুলিও শ্রেষ্ঠ ও ফযীলতপূর্ণ দিনসমূহের অন্যতম; যে মহান কাল-সময়ে আল্লাহ পাক তাঁর যিক্র করতে আদেশ করেছেন। *(কুঃ ২/২০৩)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আইয়্যামে মা'লূমাত' (বিদিত দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হল, (যুলহজ্জের) দশ দিন এবং 'আইয়্যামে মা'দূদাত' (নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হল, তাশরীকের (কুরবানী ঈদের পরের তিন) দিনসমূহ। আর এই ব্যাখ্যা অধিকাংশে উলামার। *(ফাতহুল বারী ২/৪৫৮, লাতায়িফুল মাআরিফ ৩২৯পৃঃ)*

মুফাস্সির কুরতুবী বলেন, 'উলামাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, 'আইয়্যামে মা'দূদাত' এর উদ্দেশ্য মিনার দিনসমূহ এবং তাই তাশরীকের দিন। আর এই তিনটি নাম ঐ দিনগুলির জন্যই ব্যবহার

করা হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এই আয়াতে যিক্র করার আদেশ নিয়ে হাজী-অহাজী নির্বিশেষে সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর বিশেষ করে নামাযসমূহের সময়ে নামাযীকে - একাকী হোক অথবা জামাআতে- যিক্র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কথার উপর সাহাবা ও তাবেয়ীনদের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত।' *(তফসীর কুরতুবী ৩/১৩)*

রসূল ﷺ বলেছেন, "তাশরীকের দিনগুলি পান-ভোজনের ও যিক্র করার দিন।" *(মুসলিম ১১৪১নং)*

তিনি আরো বলেছেন, (যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) "আরাফাহ, কুরবানী ও তাশরীকের দিনসমূহ আহলে ইসলাম, আমাদের ঈদ।" আর "আল্লাহর নিকট সর্বমহান দিন কুরবানীর দিন। অতঃপর তাশরীকের (ঈদের দ্বিতীয়) দিন।"

আইয়্যামে তাশরীক শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ দিন। যেহেতু এ দিনগুলি যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের সংলগ্নেই পড়ে; যার ফযীলত এই পুস্তিকার প্রারম্ভে আলোচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এই দিনগুলিতে হজ্জের কিছু আমল পড়ে, যেমন রম্ই, তওয়াফ ইত্যাদি। যাতে মূল শ্রেষ্ঠত্বে ঐ দিনগুলির সাথে মিলিত হয়। যেমন তকবীর বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে দুই প্রকারের দিনগুলিই সম্পৃক্ত।

উপর্যুক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, তাশরীকের দিনগুলিও পান-ভোজনের দিন। আনন্দ ও খুশী করার, আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষাৎ করার এবং বন্ধু-বান্ধব মিলে ফলপ্রসূ বৈঠক করার দিন। এই

দিনগুলিতে অধিকরূপে উত্তম পানাহার; বিশেষ করে মাংস ব্যবহার করা দূষনীয় নয়। তবে তাতে যেন কোন প্রকারের অপচয়, নষ্ট ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা না হয়।

এই দিনগুলি আল্লাহকে বিশেষভাবে স্মরণ ও তার যিক্র করার দিন। এই যিক্র হবে বিবিধ প্রকারেরঃ-

১। প্রতি ফরয নামাযের পর তকবীর পাঠ। যা তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত পড়তে হয়। অবশ্য অনেক উলামাগণ মনে করেন যে, তকবীর কেবল নামাযের পরেই সুনির্দিষ্ট নয়। বরং এই দিনগুলিতে যে কোন সময় সর্বদা পড়াই উত্তম।

অভিমতটি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলিকে যিক্র দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন। কিন্তু তাতে কোন নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করেন নি। তিনি বলেন, "এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহর যিক্র কর।" *(কুঃ ২/২০৩)* আর এই আদেশ হাজী-অহাজী সকলের জন্য সাধারণ। তদনুরূপ রসূল ﷺ ও বলেন, "এই দিনগুলি আল্লাহর যিক্র করার দিন।" অতএব এই নির্দেশ পালন স্পষ্টভাবে তখনই সম্ভব হয় যখন তকবীরাদি সর্বাবস্থায় (যে অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা চলে) পাঠ করা হয়। যেমন, নামাযের পরে, মসজিদে, বাড়িতে, পথে, মাঠে ইত্যাদিতে। *(নাইলুল আওতার ৩/৩৫৮)*

২। কুরবানী যবেহ করার সময় তাসমিয়াহ ও তাকবীর পাঠ।

৩। পান ও ভোজনের পর যিক্র ও দুআ। যেহেতু দিনগুলি অধিক

রূপে খাওয়া ও পান করার দিন, যাতে পূর্বে আল্লাহর নাম ও পরে তার প্রশংসা করায় যিক্র হয়।

৪। (হাজীদের জন্য) রম্ই জিমার করার সময় তকবীর পাঠ।

সুতরাং মুসলিমকে গাফলতি থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। তার উচিত, এই সময়গুলিতে আল্লাহর যিক্র ও নেক আমল দ্বারা আবাদ করা। নচেৎ আল্লাহ-ভোলা মানুষদের মত ফালতু বেশী বেশী রাত্রি জেগে কোন বিলাস ও প্রমোদ যন্ত্রের সম্মুখে বসে শুকরিয়ার পরিবর্তে পাপ করা আদৌ উচিত নয়।

অধিক খেয়ে-পান করে আল্লাহর যিক্র ও ইবাদতে সাহায্য নেওয়ায় তাঁর নিয়ামতের এক প্রকার শুকরিয়া আদায় করা হয়। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত দ্বারা উদরপূর্তি করে তার অবাধ্যাচরণ ও পাপকাজে সাহায্য নেওয়ায় তাঁর অকৃতজ্ঞতা করা হয়। আর তাঁর দেওয়া সম্পদকে অস্বীকার করলে এবং তাঁর কৃতঘ্নতা করলে কখনো তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে সম্পদ অধিকরূপে বর্ধমান হতে থাকে।

যেহেতু তাশরীকের দিনগুলিকেও ঈদ বলা হয়েছে, তাই তাতে কোন প্রকারের রোযা পালন করা শুদ্ধ নয়। কারো অভ্যাসমত যদিও এই দিনগুলিতে রোযা পড়ে, তবুও তার পরবর্তী কোন দিনে রেখে নেবে এবং এই দিনগুলিতে খান-পানের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্র করবে। *(লাতায়িফুল মাআরিফ ৩৩৩পৃঃ)*

অবশ্য যে তামাত্তু হজ্জের হাজী কুরবানী দিতে সক্ষম না হয়, সে

এই দিনগুলিতে তিনটি রোযা পালন করবে কিনা তা নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকে বলেন, 'কেবল ঐ হাজী রোযা রাখবে। কারণ আল্লাহ বলেন, "অতএব যে ব্যক্তি (কুরবানী) না পায় সে হজ্জে তিনটি রোযা (পালন করবে)। *(কুঃ ২/১৯৬)* আর 'হজ্জে' বলতে কুরবানীর পূর্বের ও পরের দিনকেও বুঝায়।' পরন্তু হযরত ইবনে উমার ﵁ এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, 'কুরবানী দিতে অক্ষম এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখার অনুমতি নেই।' *(বুখারী ১৮৯৮, ফাতহুল বারী ৪/২৪৩, নাইলুল আওতার ৪/২৯৪)*

তাশরীকের দিনগুলিতেও কুরবানী যবেহ করা যায়। তাই সর্বমোট চার দিন কুরবানী বৈধ। যেহেতু তাশরীকের দিন, কুরবানীর পরের তিন দিনকে বলা হয়। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৫/৪১২, আল-মুমতে ৭/৪৯৯)* আর নবী ﷺ বলেন, "তাশরীকের সমস্ত দিনগুলিতেই যবেহ করা যায়।" *(আহমাদ ৪/৮২, বাইহাকী ৯/২৯৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/৬১৭)* যেমন দিনের বেলায় সুযোগ না হলে রাতেও কুরবানী যবেহ করা যায়। *(আল-মুমতে ৭/৫০৩)* রাতে কুরবানী যবেহ করার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়। *(মাযাঃ ৪/২৩)* আর নামাযের নিষিদ্ধ সময়গুলোতে কুরবানী যবেহ করা নিষিদ্ধ নয়।

পরিশিষ্ট

হজ্জ সম্পর্কিত কিছু ফতোয়া

ঋণ করে হজ্জ করা যায়, যদি পরিশোধ করার সহজ উপায় থাকে (অথবা ঋণের তাগাদা না থাকে) তবে। অন্যথা ঋণ করে হজ্জ না করাই ভালো। কারণ সম্ভবতঃ ঋণ করার পরে পরিশোধ করার সামর্থ্য নাও হতে পারে। রোগাক্রান্ত বা মৃত্যু-কবলিত হলে পরিশোধ নাও হতে পারে। অতএব পূর্ণ সামর্থ্যবান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৫)*

সরকারকে ধোকা দিয়ে জাল নাম ও পাশপোর্ট নিয়ে হজ্জ করলে হজ্জ হয়ে যাবে, তবে ধোকা দেওয়ার জন্য গোনাহগার হতে হবে। *(ঐ ২/৬৭৫)*

বহুদিন সউদিয়ায় থেকে ছুটির সময় হজ্জ হলে এবং পরিবার-পরিজন হজ্জ না করে বাড়ি ফিরতে আদেশ করলে এবং হজ্জ করাতে তাদের সম্মতি না হলে, যদি ফরয হজ্জ হয় তবে তাদের কথা না মেনে হজ্জ করবে, অতঃপর বাড়ি ফিরবে। নফল হলে তাদের মন খুশী করার জন্য হজ্জ না করে বাড়ি ফিরবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)*

স্ত্রী হজ্জ করতে চাইলে এবং স্বামী তাতে বাধা দিলে স্বামীর কথা না মেনে কোন মাহরামের সাথে অবশ্যই হজ্জ করবে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর বাধা মানলে তাকে গোনাহগার হয়ে মরতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/ ১৮৪)*

উড়ো কিংবা পানি-জাহাজে হজ্জ বা উমরায় এলে নির্দিষ্ট মীকাত বরারবর জায়গায় আসার পূর্বে (জাহাজের কর্মীদের ইঙ্গিত পেলে) ইহরাম বাঁধতে হবে। অবশ্য চড়ার পূর্বে এয়ারপোর্ট থেকে গোসলাদি সেরে কাপড় পরে এখানে কেবল নিয়ত করা ভালো। জিদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা যথেষ্ট নয়। বিনা ইহরামে জিদ্দায় নামলে নির্দিষ্ট মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। জিদ্দা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করে থাকলে দম (একটি ছাগল অথবা ভেঁড়া অথবা সাত ভাগের এক ভাগ গরু বা উঁট) লাগবে; যা মক্কায় যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করতে হবে। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৪পৃঃ)*

অবশ্য যদি কেউ না জেনে কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করে 'জিদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা হবে' এই ফতোয়া নিয়ে জিদ্দা থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জ উমরাহ করে ফেলে, তবে তার উপর দম নেই। কারণ, সে তার ওয়াজেব পালন করেছে। আর ঐ ভুলের মাসূল ঐ মুফতীর ঘাড়ে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৫৬৯)*

সফরের শুরুতেই মদীনা যাওয়ার নিয়ত থাকলে পথে মীকাতে ইহরাম না বেঁধে মদীনার যিয়ারতের পর মদীনা থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা এসে হজ্জ-উমরাহ করা চলবে।

নির্দিষ্ট মীকাতের পূর্বেও ইহরাম বাঁধা চলে। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ১২পৃঃ)* অবশ্য নির্দিষ্ট মীকাত হতেই ইহরাম বাঁধা উত্তম।

হজ্জ ও উমরার নিয়ত না থাকলে মক্কা প্রবেশের জন্য ইহরাম বাঁধতে হবে না। কিন্তু মক্কায় কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি বা ব্যবসার জন্য আসার পর উমরাহ করার ইচ্ছা হলে হারাম-সীমার বাইরে বের হয়ে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করবে। হজ্জ করার ইচ্ছা হলে ঐ বাসস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ২২পৃঃ)* মিনায় থাকলে মিনা থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। *(ঐ ২৬পৃঃ)*

পূর্ব থেকেই হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীকাতের সীমা অতিক্রম করে সীমার ভিতরে কোন শহরে আত্মীয়-বাড়িতে থেকে সেখান থেকেই ইহরাম বা হজ্জ করলে দম লাগবে। নচেৎ মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসবে। অবশ্য মীকাত অতিক্রম করার সময় হজ্জ বা উমরার নিয়ত না থাকলে এবং পরে আত্মীয়-বাড়িতে ঐ নিয়ত হলে এ বাড়ি থেকেই ইহরাম বাঁধতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৯/ ১৬৯)*

ইহরাম বাঁধার পর কোন কারণবশতঃ হজ্জ (বা উমরাহ) সারতে না পারলে যথাস্থানে একটি কুরবানী করে মাথার কেশ মুন্ডন বা কর্তন করে হালাল হয়ে বাড়ি ফিরবে। অবশ্য ইহরামের সময় শর্ত লাগিয়ে থাকলে তার উপর কিছু ওয়াজেব নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/ ১৩৮)*

তামাত্তু হজ্জের নিয়তে উমরাহর ইহরাম বেঁধে উমরাহ সেরে

হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্বে যদি কোন কারণবশতঃ বাড়ি ফিরতে হয় বা হজ্জ করা না হয়, তাহলে তার উপরও কিছু ওয়াজেব হবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২১০)* উমরার ইহরাম বেঁধে কেউ অকারণে উমরাহ না করে ফিরে গিয়ে জেনে-শুনে ইহরাম খুলে ফেললে ১টি কুরবানী করবে, অথবা তিন দিন রোযা পালন করবে অথবা ছয়টি মিসকীন (নিঃস্ব)কে মাথা পিছু অর্ধ সা' (সওয়া এক কিলো) করে খাদ্য (চাল) সদকাহ করবে। (আর এই খাদ্য বা মাংস হারাম শরীফের মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে হবে।) স্ত্রী-সহবাস করলে দম লাগবে এবং মক্কা ফিরে এসে উমরাহ অবশ্যই পুরা করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৩০০)*

তামাত্তুর উমরাহ করার পর মদীনার যিয়ারতে গেলে অথবা কোন প্রয়োজনে মীকাতের বাইরে গেলে পুনরায় হজ্জের জন্য আসার সময় মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা জরুরী। এই ইহরামে আরো একটি উমরাও করতে পারে।

ক্বিরান বা তামাত্তু হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে পুনরায় ইফরাদের নিয়ত হয় না। যেমন হজ্জের মাসে উমরাহ সেরে মদীনা বা কোন (স্বগৃহ ছাড়া) সফরে গেলে হজ্জের সময় ফিরে এসে ইফরাদ হয় না। অবশ্য ক্বিরানের নিয়ত করে তামাত্তুর নিয়ত করা যায়। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৬পৃঃ)*

নিজের নামে হজ্জের বা উমরার নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে মীকাত পার হয়ে পরে অন্যের নামে পরিবর্তন করা যায় না। *(ফাতাওয়া ইবনে*

উসাইমীন ২/৬৭৬)

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী দেওয়ার ভয়ে ইফরাদের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সেরে পুনরায় তানঈম-এ গিয়ে উমরাহর ইহরাম বেঁধে উমরাহ করা শরীয়তের নির্দেশ ও নিয়মের পরিপন্থী এবং এমন করা শরীয়তের সাথে ছল-বাহানা করার নামান্তর। *(হাজ্জাতুন্নাবী, আলবানী ২০পৃঃ)*

মীকাতে গোসল করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। বাসা থেকেও গোসল করা চলে।

পেশাব ঝরার রোগ থাকলে ইহরামের কোন ক্ষতি হয় না। নামায ও তওয়াফের পূর্বে ইস্তেনজা করে ওযু জরুরী। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ২৪পৃঃ)*

তালবিয়াহ পড়তে ভুলে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ তা সুন্নত। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ১৭পৃঃ)*

ইহরাম অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বিড়াল মেরে ফেললে কিছু ওয়াজেব নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৬)*

উমরাহ করতে গিয়ে পূর্বেই মহিলার মাসিক শুরু হয়ে গেলে পবিত্রতার অপেক্ষা করবে। সফর করা জরুরী হলে ইহরাম অবস্থায় থেকে সফর করে পুনরায় ফিরে এসে উমরাহ আদায় করবে। কিন্তু বহির্দেশের হলে খরচ, ভিসা ইত্যাদির ঝামেলা থেকে বাঁচতে উমরাহ করে নিতে পারবে। অর্থাৎ, ভিসা শেষ হওয়ার ভয় থাকলে লজ্জাস্থানে পটি বেঁধে নিয়ে তওয়াফ ও সাঈ করে চুলের ডগা কেটে উমরাহ সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাবে। যেহেতু ঐ সময় তওয়াফ

করা তার জন্য জরুরী প্রয়োজন। আর অতি প্রয়োজন ও অসুবিধার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ জিনিষ বৈধ হয়ে যায়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৪৩)* তবে হজ্জের উমরাহ হলে হজ্জের কাজ সারার পর উমরাহ করে নেবে।

অনুরূপ তওয়াফে ইফাযার পূর্বে মাসিক শুরু হলে তওয়াফ ও সাঈ ছাড়া হজ্জের সব কিছুই করবে। অতঃপর সফর করার আগে পবিত্রা না হলে এবং সফর জরুরী হলে সফর করবে। কিন্তু বাড়িতে ঐ ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। স্বামীর সাথে কোন প্রকার যৌনাচারে লিপ্ত হবে না। অতঃপর পবিত্রা হলে মক্কায় ফিরে এসে তওয়াফ ও সাঈ করবে। যদি ফিরে আসা অসম্ভব হয় তাহলে মাসিক বন্ধ করার ইঞ্জেকশন (বা ট্যাবলেট) ব্যবহার করবে। তা সম্ভব না হলে লজ্জাস্থানে পটি বেঁধে তওয়াফ করে নেবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৩৭)*

তওয়াফ ও সাঈ করার পর পুনরায় খুন দেখলে, যদি তা সত্যই মাসিকের খুন হয় তবে পুনরায় তওয়াফ ও সাঈ করতে হবে। যেহেতু অপবিত্রতার কারণে পূর্বের তওয়াফ-আদি বাতিল হয়ে যাবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৪৭)*

তওয়াফে ইফাযাহ করা কালীন সময়ে কোন মহিলার মাসিক শুরু হলে তওয়াফ ছেড়ে মসজিদের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু লজ্জায় বলতে না পেরে কেউ যদি সেই অবস্থাতেই তওয়াফ-আদি সেরে বাড়ি ফিরে প্রকাশ করে তাহলে তার স্বামী বা অভিভাবকের উচিত, তাকে পুনরায় মক্কায় নিয়ে এসে তওয়াফ (এবং সাঈ জরুরী থাকলে

সাঈ) করানো। এর মধ্যে যদি সে সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে তাহলে ৩টি রোযা রাখবে অথবা ৬টি মিসকীনকে (সওয়া ১কিলো করে চাল) খাদ্য দান করবে অথবা ১টি ছাগল বা ভেঁড়া কুরবানী দিতে হবে। স্বামী-সহবাস করে থাকলে মক্কায় ১টি কুরবানী দিয়ে তার গোশ্‌ত্‌ হারামের ফকীরদের মাঝে বিতরণ করবে। আর এমন মহিলাকে উক্ত কাজের জন্য অবশ্যই তওবা করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৩৮)*

তওয়াফের পর সাঈ করার পূর্বে মাসিক শুরু হলে সাঈ সেরে নেবে। কারণ, সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত ও জরুরী নয় এবং সাঈর স্থানও মসজিদের মধ্যে গণ্য নয়। তাই সে সেখানে অবস্থান ও অপেক্ষাও করতে পারে। *(ঐ ২/২৩৯)*

এ সব ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য মহিলা মাসিক আসার সময় বুঝে মাসিক বন্ধ রাখার ট্যাবলেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। *(ঐ ২/ ১৮৫)*

ইফরাদের নিয়ত হলে তওয়াফে কুদূম না করতে পারলেও কোন ক্ষতি নেই। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৫১)* কেবল হজ্জের তওয়াফই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সে সরাসরি মিনায় যেতে পারে।

তওয়াফ করতে করতে ওযু নষ্ট হলে তওয়াফ ছেড়ে ওযু করে পুনরায় নতুন করে তওয়াফ করতে হবে।

তওয়াফে নারীদেহ স্পর্শ হলে যদি লজ্জাস্থানে কোন তরল পদার্থ অনুভূত না হয়, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য সকলের

উচিত, বেগানা নারীর স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করা। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬১৩)*

তওয়াফ ও সাঈর জন্য যদি কেউ কাউকে বহন করে তবে বাহকের জন্যও তা যথেষ্ট হবে। বাহককে আর নতুন করে পৃথকভাবে তওয়াফ ও সাঈ করতে হবে না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৩/৯৫)*

তওয়াফের পর ২ রাকআত নামায সুন্নত। কেউ ভুলে তা না পড়লে কোন ক্ষতি হয় না। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৪০পৃঃ)*

তওয়াফ করাকালে জরুরী কথাবার্তা বলা দূষণীয় নয়।

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নত। তা চুমতে গিয়ে লড়াই করা বা কাউকে ঘুষ দেওয়া মহাপাপ। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/ ১৭)*

ভিঁড়ের কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলায় উঠে তওয়াফ ও সাঈ করা যায়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১/ ১৯৪)*

কারণবশতঃ তওয়াফের ২/৩ দিন পরও সাঈ করতে পারা যায়। যেহেতু তা তওয়াফের পরপরই করা কোন শর্ত নয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৫২)*

হজ্জের তওয়াফের আগে সাঈ করে নেওয়া যায়। অবশ্য উত্তম হল, তওয়াফের পরই সাঈ করা। তবে উমরার তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা যায় না; করলে তওয়াফের পর পুনরায় সাঈ করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬২২, ৬২৪)*

সাঈর এক চক্কর ছুটে গেলে এবং বহু পরে মনে পড়লে অথবা

সুযোগ হলে পুনরায় নতুনভাবে ৭ চক্কর সাঈ করবে। *(ঐ ২/৬২৩)* হালাল হয়ে সফর করে থাকলে মনে পড়া মাত্র পুনরায় ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে নতুনভাবে সাঈ করে চুল কাটবে। *(ঐ ২/৬২৮)*

না জেনে ঠিক তওয়াফের মত সাঈও ৭ চক্কর (অর্থাৎ ১৪ বার যাতায়াত) করে থাকলেও ৭ বারই গণ্য হবে এবং অজান্তে বাড়তি করায় কোন ক্ষতি হবে না। *(ঐ ২/৬২৬)*

সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করলে সাঈ হবে না। পুনরায় সাফা থেকে শুরু করে সাঈ করতে হবে। *(ঐ ২/৬২৮)*

যুল হজ্জের ৮ তারীখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়লে এবং মিনায় রাত্রি বাস না করলে কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য তা সুন্নত। মতান্তরে ওয়াজেব। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৭পৃঃ)*

আরাফার ময়দানে হাত তুলে দুআ করা যায়। জামাআতের একজন দুআ ও বাকী 'আমীন-আমীন' করলেও দোষ নেই। তবে একাকী দুআই এখানে শরীয়ত-সম্মত ও উত্তম। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৬৭-২৬৮, আল-মুমতে ৭/৩২৯-৩৩০)*

আরফার সীমা থেকে সূর্য ডোবার পূর্বেই বের হয়ে এলে ফিদ্য়্যাহ লাগবে; যা মক্কায় যবেহ করে সেখানকার গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। দেশে ফিরে গেলে এবং পুনরায় মক্কায় যাওয়া সম্ভব না হলে মক্কার মুসাফির বা পরিচিত কাউকে এ দায়িত্বভার সমর্পণ করবে। কেউ না থাকলে দেশেই যবেহ করে গোশ্ত গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৬/২৫৪, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৬৪)*

মুযদালিফায় রাত্রিবাস ওয়াজেব। ত্যাগ করলে দম লাগবে। মুযদালিফায় ফজরের নামায পেলে সেটুকুই যথেষ্ট। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭১)* আরাফা থেকে মুযদালিফা আসতে আসতে যদি অর্ধরাত্রি পার হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে মাগরিব-এশার নামায চলার পথে মুযদালিফার বাইরে হলেও পড়ে নেবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭০)*

মাশআরুল হারামে গিয়ে দুআ করা ওয়াজেব নয়; করা ভালো। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭১)*

মুযদালিফার সীমানায় প্রবেশ না করতে পারলে সেখানে রাত্রিবাস মাফ হয়ে যাবে এবং দম লাগবে না। *(ঐ)* এখান থেকে মুআল্লিমের বাস অর্ধরাত্রির পূর্বে তাড়াহুড়া করে চলে যেতে চাইলে বাস ছেড়ে পায়ে হেঁটে ফজরের পর মিনায় যাবে। হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে বাসেই যাবে। বাধ্য হওয়ার কারণেই তার উপর দম ওয়াজেব হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬০০)* এ স্থান হতে অর্ধরাত্রির পর মিনা যাওয়া যায়। তবে চন্দ্র অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। আর এ শুধু দুর্বল শ্রেণীর মানুষ (ও তাদের সহযোগী সঙ্গী)দের জন্য। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭২)* অর্ধরাত্রির পর এই শ্রেণীর মানুষরা জামরায়ে আক্বাবায় পাথর মেরে মক্কায় হজ্জের তওয়াফও করতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৮৬)* তবে অর্ধরাত্রির পূর্বে রম্ই ও তওয়াফ করলে তা শুদ্ধ হবে না। করে ফেললে পুনরায় করতে হবে। নচেৎ রম্ইর জন্য মক্কায় দম দেবে এবং তওয়াফ যুল হজ্জের বা মুহার্রামের শেষে অথবা যখন ভুল বুঝতে পারবে তখনই মক্কা এসে

পূর্ণ করবে। নচেৎ হজ্জ হবে না।

তওয়াফে ইফায্বাহ সফর করা পর্যন্ত পিছিয়ে রাখা যায়। ভিঁড়ের ভয়ে যুল হজ্জের শেষের দিকেও করা যায়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬২৪)* বরং সঠিক ওযর থাকলে যুল হজ্জ মাসের পরেও করতে পারে। *(ঐ ৬৪০)*

তওয়াফে ইফায্বার পূর্বে কেউ মারা গেলে তার তরফ থেকে তওয়াফ পূর্ণ করতে হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬১২)*

তওয়াফ ও সাঈ করতে করতে বৈধ কথা বলা, পানি পান করা, ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু আরাম নেওয়া বৈধ। *(ঐ ২/৬২০)*

পাথর মেরে কেশ মুন্ডন করার পর তওয়াফে ইফায্বাহর পূর্বে স্ত্রী-চুম্বন বা আলিঙ্গনের ফলে বীর্যপাত করলে তওবা সহ দম লাগবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৭৪)*

প্রথম হালালের পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী-সহবাস করে ফেলে তবে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য বাকী হজ্জের কাজ তাকে পূরণ করতে হবে এবং কাফ্ফারা স্বরূপ একটি উঁট কুরবানী দিয়ে তার গোশ্ত মক্কার মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। আর ঐ বাতিল হজ্জ নফল হলেও তাকে আগামীতে নতুনভাবে পালন করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭২)*

স্বপ্নদোষে বীর্যপাত ঘটলে হজ্জ বা উমরার কোন ক্ষতি হয় না। *(ঐ ২/২৩৩-২৩৪)*

তওয়াফে ইফায্বাহ বা সাঈ কেউ করতে সক্ষম না হলে অন্য কেউ

তার নায়েব হয়ে করে দিতে পারে না। খাট বা ঠেলা গাড়িতে বসে অথবা কারো কাঁধে বা পিঠে চড়ে তাকে নিজে করতে হবে। যদি সম্ভব না হয় তবে রোগ বা দুর্বলতা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ইহরাম খুলবে না। যদি আরোগ্যের আশা না থাকে তবে একটি ছাগল বা ভেঁড়া যবেহ করে তার গোশ্ত মক্কার গরীবদের মাঝে বিতরণ করে হালাল হয়ে যাবে এবং হজ্জ আগামীতে কাযা করবে। *(ঐ ২/২৪৩)*

কোন কারণবশতঃ হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে ১০টি রোযা রাখবে। ৩টি হজ্জে, আরাফার দিনের পূর্বে রেখে নেবে এবং বাকী ৭টি দেশে ফিরে রাখবে। আরাফার দিন রোযা রাখবে না। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৮পৃঃ)* হজ্জের মধ্যে ঐ ৩টি রোযা তাশরীকের দিনগুলিতে ১১, ১২, ১৩ তারীখেও রাখতে পারে। আর এটা ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ আইনের ব্যতিক্রম। তবে আরাফার দিনের পূর্বেই রোযা রেখে নেওয়া উত্তম; যদি তার পূর্ব থেকেই জানা থাকে যে, সে কুরবানী দিতে পারবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৯৫-২৯৬)* মক্কাবাসী হাজীদের জন্য ঐ কুরবানী নেই।

১৩ তারীখের সূর্য অস্ত গেলে আর কুরবানী সিদ্ধ হবে না। *(ঐ ২/২৯৬)* অতএব ৩টি রোযা রেখে তাশরীকের দিনসমূহ অতিবাহিত করে পুনরায় কুরবানী দিতে চাইলে আর হবে না। বাকী রোযা দেশে পূর্ণ করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৬০)*

কুরবানী মিনাতেই যবেহ করা জরুরী নয়। মক্কার হারামের সীমার

ভিতরে যে কোন স্থানে কুরবানী যবেহ করা যায়। হারামের সীমার বাইরে হজ্জের কুরবানী সিদ্ধ হবে না; যদিও তার গোশ্ত্ হারামের ভিতরে বিতরণ করা হয়।

কুরবানী যবেহ করে সম্পূর্ণ ফেলে দেওয়া বৈধ নয়। বরং তার কিছু খাওয়া ও দান করা কর্তব্য। কুরবানী করতে ভুলে গিয়ে দেশে ফিরলে কুরবানী সত্বর মক্কায় পাঠাতে হবে।

চুল কাটতে ভুলে গিয়ে সফর করার পর স্মরণ হলে, স্মরণ হওয়া মাত্র (পুরুষ হলে এবং ইহরামের কাপড় খুলে ফেললে) ইহরামের কাপড় পরবে এবং হজ্জ পুরা করার নিয়তে চুল কেটে নেবে। অতঃপর যদি এর পূর্বে মক্কায় স্ত্রী-সহবাস করে থাকে তবে মক্কায় ১টি (ছাগল বা ভেঁড়া, নচেৎ উঁট বা গরুর ৭ ভাগের ১ ভাগ) দম লাগবে। আর সে গোশ্ত্ সেখানকার গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তবে যদি সহবাস মক্কার বাইরে কোথাও হয় তবে দেশেই ঐ ফিদ্য়্যাহ যবেহ করে দেশের গরীবদের মাঝে তার গোশ্ত্ বিতরণ করতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)* তদনুরূপ যে ব্যক্তি না জেনে মাথার সম্পূর্ণ চুল না ছেঁটে কেবল এখান-ওখান থেকে কিছু চুল কেটে হালাল হয়েছে সে ব্যক্তির জন্যও বিধান এই। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৩৪)*

তাশরীকের রাত্রিগুলো মিনায় যাপন করা জরুরী। অবশ্য ১২ তারীখের সূর্যাস্তের পূর্বে বের হয়ে গেলে ১৩ তারীখের রাত্রি যাপন করতে হয় না। কিন্তু যদি কেউ ১১ তারীখে মিনা ত্যাগ করে চলে

যায় তবে তাকে ফিদ্য়্যাহ দিতে হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৮৮)* অবশ্য অসুখের কারণে ত্যাগ করতে বাধ্য হলে কোন কিছু ওয়াজেব নয়। আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব অর্পণ করেন না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭৬)*

রাত্রির অধিকাংশ সময় মিনায় কাটিয়ে বাকী সময় (অথবা সারা দিন) অন্য কোথাও বা মাসজিদুল হারামে কাটানো যায়। তাতে কোন ক্ষতি হয় না। *(ঐ ২/২৭৪)*

মিনায় থাকার জন্য জায়গা না পেলে মিনার সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় মিনায় অবস্থানকারী অন্যান্য হাজীদের পাশাপাশি স্থান নিয়ে বাস করবে। মিনার সীমানার ভিতরে জায়গা পায়নি বলে মক্কায় রাত্রিযাপন বৈধ হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬০৪)*

যেমন সামর্থ্য থাকতে কম ভাড়া পেয়ে মিনা ছেড়ে মুযদালিফায় খিমা নেওয়া বৈধ নয়।

নিরুপায় হলে রাত্রিতেও পাথর মারা যায়। এক দিনের পাথর পর দিনে মেরে কাযা করা যায়। *(ঐ ২/২৮৪)* অবশ্য আগামী কালের পাথর আজ আগাম মারা যায় না।

পাথর মারতে সক্ষম ব্যক্তি অপরকে প্রতিনিধি করতে পারে না; করে থাকলে দম লাগবে। যাকে প্রতিনিধি করা হবে তাকে বর্তমানে হাজী হতে হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১৪০)* প্রতিনিধি পাথর না মারা পর্যন্ত মিনা ত্যাগ করা যাবে না। সুতরাং ১২ তারীখের সকালে কাউকে পাথর মারতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মিনা ত্যাগ করা

বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৪০-২৪২)*

তাশরীকের (১১, ১২, ও ১৩ তারীখের) দিনগুলিতে সূর্য ঢলার আগে পাথর মারা সিদ্ধ ও যথেষ্ট নয়। সূর্য ঢলার পূর্বে পাথর মেরে সফর করে থাকলে মক্কায় ফিদ্য়্যাহ লাগবে।

তদনুরূপ ৭টি পাথরকেই একই সঙ্গে ছুঁড়ে মারলে, ছোট জামরাহ থেকে শুরু না করে বিপরীত দিকে বড় জামরাহ থেকে শুরু করে পাথর মেরে থাকলেও মক্কায় দম লাগবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৮৫, ২৮৬)* অবশ্য সময় থাকতে কাযা করে নিলে দম লাগবে না।

পাথর দেওয়ালে লাগা জরুরী নয়; জরুরী হল হওযে পড়া। হওযে না পড়লে দম লাগবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৩৫-৬৩৬)* যেমন পাথর হওযে ফেলে দিলে যথেষ্ট নয়; বরং তা ছুঁড়ে মেরে হওযে ফেলতে হবে।

রম্ই শেষ হওয়ার পূর্বে পাথর শেষ হয়ে গেলে হওয থেকে দূরে কোন জায়গা হতে পাথর কুড়িয়ে এনে বাকী রম্ই পূর্ণ করে নেওয়া যাবে। *(ঐ ২৩৬)*

প্রকাশ থাকে যে, রম্ইর পাথর পাথরই হতে হবে। রত্ন, মাটি, সিমেন্ট বা পিচের ঢেলা হলে তা দিয়ে রম্ই সহীহ নয়। *(আল-মুমতে' ৭/৩৫৭)*

মিনায় রাত্রিবাস ও সমস্ত রম্ই ত্যাগ করলে ১টি মাত্র ফিদ্য়্যাহ দিলেই যথেষ্ট হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৩/৯৪)* অবশ্য ফিদ্য়্যাহ দেওয়ার পর পুনরায় কোন ওয়াজেব ত্যাগ করলে পুনরায় ফিদ্য়্যাহ লাগবে।

ঋতুমতী মহিলার জন্য তওয়াফে বিদা' মাফ। দুর্বল ও রোগী হাজীদেরকে বহন করে বিদায়ী তওয়াফ করাতে হবে। ত্যাগ করলে দম লাগবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৬/২৫৪, ১৪/১৩৭)* তওয়াফে বিদা'র পরপরই মক্কা ত্যাগ করতে হবে। বহু দেরী করে ফেললে পুনরায় তওয়াফ করতে হবে। অবশ্য তওয়াফের পর কিছু কেনা-কাটা করায় ও সঙ্গীদের অপেক্ষায় কিছু দেরী হওয়ায় দোষ নেই। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৪৩পৃঃ)*

সফরের দিন মক্কায় গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ করে পুনরায় মিনায় এসে কাঁকর মেরে বাড়ি ফিরা বৈধ নয়। *(দলীলুল হাজ্জ দ্রঃ)*

বিদায়ী তওয়াফের পর না জেনে ভুলক্রমে সাঈ করে ফেললে কোন কিছু ওয়াজেব হয় না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬২৫)*

বিদায়কালে কাবার মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় উল্টা পায়ে বের হয়ে সম্মান প্রদর্শন এবং মসজিদের দরজায় বিশেষ বিদায়ী দুআ পাঠ শরীয়ত-সম্মত নয়।

পুরুষ মহিলার তরফ থেকে এবং মহিলা পুরুষের তরফ থেকে হজ্জে বদল করতে পারে। তবে এর জন্য শর্ত এই যে, তাকে নিজের হজ্জ আগে করে থাকতে হবে। গরীব সামর্থ্যহীন পিতা-মাতার তরফ থেকে হজ্জ করা যায়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৭২-৭৩)*

জীবিত অবস্থায় কেউ একাধিকবার হজ্জ করে মারা গেলেও তার তরফ থেকে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল হজ্জ করা যায়। *(ঐ*

১৮/১১৮)

একই সফরে পিতার নামে উমরাহ ও মাতার নামে হজ্জ করা যায়। *(ঐ ১২/৯৭)*

শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে কারো দ্বারা হজ্জে বদল করানো শুদ্ধ নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৫০)*

মৃত মা-বাপের তরফ থেকে নায়েব বানিয়ে হজ্জ করানো যায়। *(ঐ ২/৬৫১)*

হজ্জে বদলের জন্য খরচ নিয়ে বেড়ে গেলে যদি দেওয়ার সময় মুওয়াক্কেল বলে যে, 'যা খরচ হয় করো বা এই অর্থ থেকে খরচ করো' তাহলে বাকী অর্থ ফেরৎ দিতে হবে। অন্যথা যদি অর্থ দেওয়ার সময় বলে যে, 'এ অর্থ তোমাকে আমার নামে হজ্জ করার জন্য দিলাম' তাহলে ফেরৎ না দিলেও দোষ নেই। *(ঐ ২/৬৫২)* প্রকাশ থাকে যে, এক বছরে দুই জনের তরফ থেকে হজ্জ করা যায় না।

একই সফরে বারবার উমরাহ; একবার মায়ের জন্য, দ্বিতীয়বার বাপের জন্য, তৃতীয়বার দাদীর জন্য এবং এইভাবে আর কারো জন্য (বা নিজের জন্য) তানঈম থেকে আসা-যাওয়া করে আদায় করা বিধিসম্মত নয়। তাছাড়া মৃতের নামে হজ্জ করার চেয়ে দুআ করাই বেশী উত্তম। *(ঐ ২/১৯৮, ২৬৬)*

মৃত বেনামাযীর তরফ থেকে হজ্জ গৃহীত হবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৮৬)*

হজ্জ করার জন্য কেউ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করলে তা গ্রহণ করা বৈধ এবং দানের টাকায় হজ্জ করলেও ফরয আদায় হয়ে যায়।

পিতার পয়সায় হজ্জ করলে পুত্রের ফরয আদায় হয়ে যায়। *(ঐ ২/১৮৮)*

ফরয হওয়া সত্ত্বেও পিতা হজ্জ না করে মারা গেলে পুত্র বা ওয়ারেসের উচিত, নিজের হজ্জ আদায় করে তার তরফ থেকে হজ্জ করা, অথবা পিতার ছেড়ে যাওয়া অর্থ থেকে কোন হাজীকে খরচ দিয়ে তার তরফ থেকে হজ্জ করার দায়িত্ব দেওয়া। *(ঐ ২/১৯৪)* যেমন ছেলে হজ্জ ফরয রেখে মারা গেলে তার পিতা বা অভিভাবকের উচিত, তার তরফ থেকে ফরয পালন করে দেওয়া। *(ঐ ২/১৯৫)*

প্রকাশ যে, নফল হজ্জ-উমরাহ করতে অর্থ ব্যয় করার চেয়ে ঐ অর্থ জিহাদে ব্যয় করা অধিক উত্তম। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৭)*

শিশুকে হজ্জ করালে, শিশু যদি এমন কাজ করে বসে যাতে ফিদ্য়্যাহ ওয়াজেব, তাহলে অভিভাবককে তার তরফ থেকে তা আদায় করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৮২)*

পাপকর্মে অটল থেকে হজ্জ করলে হজ্জ শুদ্ধ, তবে অসম্পূর্ণ। পাপ থেকে তওবা জরুরী। শির্ক করা অবস্থায় হজ্জ করলে তো তা মকবূলই নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১৪০)*

কোন বেনামাযী হাজীর হজ্জ গৃহীত নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৮৭)*

হজ্জের নামে উদ্দেশ্য ভিন্ন হলে হজ্জ হয় না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৮)* তবে আসল উদ্দেশ্য হজ্জ হলে এবং তার সাথে কিছু ক্রয়-বিক্রয় ও বৈধ ব্যবসা করলে হজ্জের কোন ক্ষতি হয় না। *(কুঃ ২/১৯৮)*

হজ্জ করার জন্য হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ হওয়া জরুরী। বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের ব্যবসার অর্থে হজ্জ হয় না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৬/১১৬)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত

দ্বীনী বই ছেপে তবলীগে শরীক হোন এবং সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাসিল করুন।